প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

সপ্তম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০১৭

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

---

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2017; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

রা জ নী তি

বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন ৯
আলী রীয়াজ

স মা জ

নার্স ৩৭
শাহাদুজ্জামান

আ ন্ত র্জা তি ক

মিয়ানমারের মানবাধিকার আইকনের কী হলো? ৫৫
হান্নাহ বিচ

আ ন্ত র্জা তি ক

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সত্তা ও সংকটের সময়ক্রম : ১৭৮৪ থেকে ২০১৭ ৭১

আ ন্ত র্জা তি ক

গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী শ্রীলঙ্কা ৯৭
দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকটের স্বরূপ
আলতাফ পারভেজ

ব ই আ লো চ না

ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণের ইতিবৃত্ত ১৩১
আসজাদুল কিবরিয়া

লেখক পরিচিতি ১৪৯

চলতি সংখ্যাটি *প্রতিচিন্তা*র ২০তম সংখ্যা। ধারাবাহিকভাবে ২০টি সংখ্যা বের করা *প্রতিচিন্তা*র জন্য একটা মাইলস্টোন। *প্রতিচিন্তা* সময়মতো বের করার জন্য তাগিদ আমরা সব সময় অনুভব করি। সব সময় যে পারি, তেমনটি নয়। নানা কারণে *প্রতিচিন্তা*র বর্তমান সংখ্যাটি বের করতে আমাদের বিলম্ব হলো। সে জন্য পাঠকের কাছে বিশেষভাবে দুঃখিত। বিগত দিনগুলোয় যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আমাদের সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করার জন্য উপদেষ্টা পর্ষদ ও সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদের জানাই অভিনন্দন।

আধুনিক মানুষ ও সমাজ স্বাভাবিকভাবেই সভ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য আচরণে অভ্যস্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজ পর্যায়ে অযৌক্তিক ও অমানবিক আচরণ ঘটে চলেছে ঘরে-বাইরে। তবে মানুষের এই আচরণ আদি-মনোবৃত্তিক। আদিম মানুষের এমন কিছু প্রবৃত্তি ছিল, যা যুক্তিবোধ ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণিত বলে চিহ্নিত হওয়া শুরু হয়েছিল। শক্তির জোরে কোনো মানুষ বা জাতিগোষ্ঠীর ওপর পাশবিক বর্বরতা বা নৃশংসতা এমনই একটি প্রবৃত্তি। কিন্তু এমন সব প্রবৃত্তি ঘৃণিত বলে প্রচারিত হলেও তা বন্ধ হয়নি। সময়ে সময়ে তার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। একবিংশ শতাব্দীতে আরও একটি ভয়ানক নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করছে দুনিয়া। মিয়ানমার সরকার তার দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করতে বেছে নিয়েছে পাশবিক নির্যাতনের পন্থা। দলে দলে এসব রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মতো বিপুল জনসংখ্যা ও স্বল্প সম্পদসম্পন্ন একটি দেশে তা সন্দেহাতীতভাবেই এক বড় বোঝা। কূটনৈতিক দক্ষতা ব্যবহার করে এই সংকটের আশু সমাধান করতে হবে।

*প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যায় তিনটি জাতিগত নিধন বা এথনিক ক্লিনজিং বিষয়কে তুলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো মিয়ানমার সরকারের নেওয়া

রোহিঙ্গাদের চলমান জাতিগত নিধন। দ্বিতীয়টি শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী তামিলদের সঙ্গে ক্ষমতাশালী সিংহলিদের দ্বন্দ্ব। তৃতীয়টি হলো বহুকাল ধরে ঝুলে থাকা ফিলিস্তিনিদের নির্মূলপ্রক্রিয়া।

*প্রতিচিন্তা*র এই সংখ্যা সাজানো হয়েছে কয়েকটি বিষয়ের সংমিশ্রণে। এর একটি হলো বাংলাদেশের রাজনীতি ও বিকাশমান মধ্যবিত্তের সম্পর্কের দিকটি। একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেকোনো সমাজে গণতান্ত্রিক উত্তরণে বড় ভূমিকা রাখে এবং ধর্মের রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মত দেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি তা প্রযোজ্য? সে বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন আলী রীয়াজ।

নার্সিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেশা। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে স্বাস্থ্য এক বিরাট জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে নার্সদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের সমাজের বাস্তবতায় নার্সিং পেশাকে যেমন সম্মানজনক হিসেবে দেখা হয় না, তেমনি নার্সদের ভূমিকাও আশানুরূপ নয়। এ কারণে এই পেশায় দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে না। সমকালীন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও গবেষক শাহাদুজ্জামান নার্সদের নিয়ে একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা করেছেন। এই পেশা সম্পর্কে নার্সদের মনোভাবনা এবং তাঁদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাবনা নার্সদের চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন। প্রবন্ধটি *সেজ* থেকে অনুবাদ করেছেন রোকেয়া রহমান।

রোহিঙ্গা সংকট চলমান রয়েছে। সে বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত মতামত দেওয়া কঠিন। তবে *নিউ ইয়র্কার* ম্যাগাজিনে সাংবাদিক হান্নাহ বিচের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সংগ্রামী নেত্রী হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত অং সান সু চির মানবাধিকার প্রশ্নে নীরব ভূমিকা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। সু চির বর্তমান অবস্থান কি নতুন কোনো ঘটনা, নাকি তাঁর পূর্বের অবস্থানেরই ধারাবাহিকতা? গৃহবন্দী সু চিকে মিয়ানমারের জনগণ ও বিশ্ববাসী যেসব গুণে সমৃদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিল, তা আসলে কতটুকু সঠিক ছিল? এসব মৌলিক প্রশ্নের হয়তো স্বতঃসিদ্ধ উত্তর এখনই পাওয়া যাবে না, কিন্তু ব্যক্তি সু চি কি বদলেছেন, নাকি এমনই ছিলেন—তার কতিপয় প্রমাণ এই লেখায় মিলবে।

এ ছাড়া রোহিঙ্গা সংকটের সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘটা বড় ঘটনাগুলো একত্র করে একটি সময়ক্রম আমরা *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের সামনে হাজির করেছি। পাঠক এখান থেকে পুরো সংকটটি একটি জায়গায় পাবেন। ওয়্যার ডট কমের ওয়েবসাইটে আলাল ও দুলাল কালেক্টিভ কর্তৃক সময়ক্রমটি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি লেখাই ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন খলিলউল্লাহ।

দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই জাতিগত সংকট চলমান রয়েছে। বর্তমানে আরাকানে যা চলছে, শ্রীলঙ্কার তামিলদের ক্ষেত্রেও তেমন জাতিগত সংকট রয়েছে। লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সিংহলি সরকারের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের অবসান ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সংকট পুরোপুরি নিরসন হয়নি। শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী যে সংকট চলছে, তার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকটের সাদৃশ্য রয়েছে। আলতাফ পারভেজের নিবন্ধটিতে এই সংকটের স্বরূপ ধরা পড়েছে।

সবশেষে রয়েছে একটি বই আলোচনা। বই আলোচনাটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অনেক বছরের পুরোনো একটি জাতিগত নিধনকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। জাতিগত নিধনের চিত্র সারা দুনিয়ায় একই রকম। আরাকানে মিয়ানমার সরকার যেমন রোহিঙ্গাদের নিশ্চিহ্ন করছে, তেমনি ইসরায়েলও ফিলিস্তিনিদের বহুদিন ধরে ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন করায় প্রবৃত্ত রয়েছে। প্রবাসী ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ ও সমাজতান্ত্রিক কর্মী ইলান পেপে তাঁর *দ্য এথনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন* গ্রন্থে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। আর সেই বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া।

রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন

আলী রীয়াজ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে গত কয়েক বছরের সংঘটিত ঘটনাবলি ও প্রবণতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে দুটি বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট, অন্যটি হচ্ছে রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব। এই ঘটনাবলির প্রেক্ষাপট হচ্ছে বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, যা দেশে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশে সাহায্য করেছে। অতীতে এ কথা তত্ত্বগতভাবে এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা হতো যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মধ্যবিত্তের বিকাশ একাদিক্রমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে ও সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের রাজনৈতিক আবেদন হ্রাস করে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কি তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? এই নিবন্ধে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তোলা এবং কিছু অনুমান বা হাইপোথিসিস উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনার তাগিদ দেওয়া এই লেখার প্রধান লক্ষ্য, যা বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র বোঝার জন্য জরুরি, নীতিনির্ধারকদের এবং সমাজ পরিবর্তনে আকাঙ্ক্ষীদের জন্যও এ ধরনের আলোচনা সহায়ক। কিন্তু এ ধরনের গবেষণা ও আলোচনার আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে পূর্বধারণার বৃত্তে নিজেদের সীমিত না রাখা।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাংলাদেশ, প্রবৃদ্ধি, মধ্যবিত্ত, গণতন্ত্র, ধর্ম, রাজনীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

ভূমিকা

আমার এই নিবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে আলোচনার জন্য বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তোলা এবং কিছু অনুমান বা হাইপোথিসিস উপস্থাপন করা। ফলে আমি এই নিবন্ধে কোনো রকম উপসংহার তুলে ধরার চেষ্টা করব না। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিকে সামনে রেখে এসব প্রশ্নের উত্থাপন। এসব প্রশ্ন এবং অনুমানের একটি ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতিপয় তত্ত্ব, অন্য আরেকটি ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ। ফলে এগুলো যেমন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে বলে আশা করি, তেমনি এগুলোর দ্যোতনা (ইমপ্লিকেশন) রয়েছে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বসমূহের জন্যও।

পটভূমি

বাংলাদেশের রাজনীতি যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন এবং গত কয়েক বছরের ঘটনাবলির দিকে যাঁরা নজর রেখেছেন, তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট যে রাজনীতিতে দুটি বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট, অন্যটি হচ্ছে রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট নতুন নয় এই অর্থে যে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯০ সালের পর এ অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রথম দেড় দশকে সাফল্যের মাত্রা আশাব্যঞ্জক ছিল না। ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে অপ্রত্যক্ষ সেনাশাসনের সূচনায় অনেকেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে ফিরে যাবে। যাঁরা ঘটনাবলিকে দীর্ঘ মেয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন, তাঁদের এই আশঙ্কার কারণ কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসই ছিল না, ছিল বাংলাদেশের বাইরের অভিজ্ঞতাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে কোনো দেশে ভঙ্গুর গণতন্ত্র থাকলে তা দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। 'ভঙ্গুর গণতন্ত্র' থেকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের উত্থানের আশঙ্কাই বেশি। সেই প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রকম মনে করা হতে থাকে যে সামরিক কর্তৃত্ববাদের পথেই দেশটি অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু অচিরেই এটা বোঝা যায় বাংলাদেশে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে না। ২০০৮ সালের শেষে একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে বেসামরিক নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়। ধরে নেওয়া হয় যে বাংলাদেশ কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সংবিধানের পরিবর্তন এবং ক্ষমতাসীন দলের আচরণ

ভিন্ন রকম ইঙ্গিত দিতে থাকে। ২০১৪ সালে প্রায় সব বিরোধী দলের বর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দল এককভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন করে, যার ফলে সংসদে বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্বই নেই (নির্বাচনের আগের ও নির্বাচনের সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার জন্য দেখুন, রীয়াজ ২০১৪)। ওই নির্বাচনের আগে এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন দল এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা মর্মবস্তুর দিক থেকে গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হতে পারে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলাদেশের ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল বাণীটি ছিল গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ভিত্তি—মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার—তার সারবস্তু হচ্ছে সব নাগরিকের সমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র শুধু প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভেই ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এখন প্রশ্ন উঠছে কয়েক দফা কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিজ্ঞতার পরও দেশটি আবার সেই পথেই যাত্রা শুরু করেছে কি না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং ২০১৭ সালে এসে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনায়, তা গণমাধ্যমেই হোক কি নীতিনির্ধারক পর্যায়েই হোক, বারবার আলোচিত হচ্ছে তা হলো সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে 'সেক্যুলারিজম'কে (যাকে সংবিধানের বাংলা ভাষ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলা হয়) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা এবং ধর্মভিত্তিক সংগঠন তৈরির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাই পাওয়া গিয়েছিল যে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সেই নিষ্পত্তি হচ্ছে : এই দুইয়ের মধ্যে দেয়াল তুলে দেওয়া গেছে, রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অবসান করা গেছে। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সেক্যুলারিজমের/ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান হয়, রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলের আবির্ভাব ঘটে, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দল-নির্বিশেষে ধর্মীয় প্রতীক ও রেটরিক ব্যবহৃত হতে থাকে। নব্বইয়ের দশকে কেবল যে রাজনীতিতেই ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তা নয়, সমাজে ও দৈনন্দিন জীবনাচরণে ধর্মের ব্যাপক এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামপন্থী দলের—সংস্কারবাদী, রক্ষণশীল, উগ্রপন্থী, সহিংস চরমপন্থী—বিকাশ লাভ করে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে সংবিধানে পুনঃস্থাপন করা হলেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল

থেকেছে এবং ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার কোনো লক্ষণই আর উপস্থিত নেই। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ধরনের ইসলামপন্থী জঙ্গি সংগঠনের উপস্থিতি ঘটতে শুরু করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সমাজজীবনে ইসলামের উপস্থিতি। বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে স্থানীয় ও সমন্বয়বাদী (সিনক্রেটিক) ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হতো, তার পরিবর্তে একটি আক্ষরিক (লিটারালিস্ট) ও বৈশ্বিক ব্যাখ্যার ইসলামেরই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

এই দুই প্রপঞ্চের উপস্থিতির প্রেক্ষাপট হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল দেশ ও রাষ্ট্র। উনিশ শ একাত্তর সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের পর ৪৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্রগঠন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, ফলে পরিবর্তন এখনো অব্যাহত আছে এবং তা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের পরিবর্তনের কথা উঠলেই যেটি কমবেশি সবাই প্রথমেই বলেন তা হচ্ছে এর অর্থনীতির পরিবর্তন—একসময় যে দেশটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি'তে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এটি একটি 'উন্নয়নের পরীক্ষাগার', সেই দেশটি এখন অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনার দেশ বলে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাইসওয়াটারহাউস কুপারের হিসাব অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ পৃথিবীর ২৮তম বৃহৎ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হবে। মোট অর্থনীতির আকার দাঁড়াবে ৬২৮ বিলিয়ন ডলার থেকে যথাক্রমে ১৩২৪ বিলিয়ন ডলার এবং ৩০৬৪ বিলিয়ন ডলার (জামাল, ২০১৬)।

আমার আলোচনার পটভূমি হচ্ছে এই তিনটি দিক—বড় আকারের বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক সাফল্য, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম, অর্থাৎ ইসলামি ভাবধারার ব্যাপক বিস্তার এবং রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমাগত সংকোচন। আমার লক্ষ্য হচ্ছে, এই তিন দিকের মধ্যকার সম্পর্কের কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা এবং প্রশ্ন উত্থাপন করা।

তত্ত্বগত কাঠামো

রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি নিশ্চল বা অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়; এসবের পরিবর্তনই স্বাভাবিক। উপরন্তু এগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে। এর একটি পরিবর্তিত হবে কিন্তু অন্যগুলো স্থির থাকবে, এমন মনে করা সঠিক নয়। কোনটি কোনটিকে প্রভাবিত করে, এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। যাঁরা 'অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ' বা ইকোনমিক ডিটারমিনিজমে আস্থা রাখেন; যাঁরা অর্থনীতিকে, বিশেষ করে কোনো সমাজের উৎপাদন-কাঠামো এবং

উৎপাদন সম্পর্ককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁরা অর্থনীতির পরিবর্তনকেই অন্যান্য পরিবর্তনের চালক বলে দাবি করেন। মার্ক্সবাদীদের একাংশ এ ধারণার অনুসারী। অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদের অনুসারীদের বাইরেও সমাজবিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা অর্থনীতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে এটা কেবল অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিষয় নয়, যেকোনো রাষ্ট্র কীভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তার কী ভূমিকা, সেটাও রাষ্ট্রের কাঠামো এবং সমাজের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে, ক্ষেত্রবিশেষে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা দেখান যে বৈশ্বিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের বিস্তৃতি এবং সেই কাঠামোয় কোন রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করবে, তার ওপরে রাষ্ট্রের চরিত্র, প্রকৃতি, সক্ষমতা নির্ভরশীল। ইম্মানুয়েল ওয়ালেরস্টিন, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক এবং তাঁর অনুসারী যাঁরা বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব (ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস থিওরি) এবং নির্ভরশীলতার তত্ত্বের (ডিপেনডেন্সি থিওরি) আলোকে সমাজ-রাজনীতি বিশ্লেষণে উৎসাহী, তাঁদের বক্তব্যের সহজ সারাংশ এই রকম (ফ্রাঙ্ক, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৯; ওয়ালেরস্টিন, ১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৮৯)।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে সমাজে বিরাজমান শক্তিগুলো কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ অনেকাংশেই নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। তাঁদের বিবেচনায় সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত; কেউ কেউ এর মধ্যে বর্ণ এবং এথনিসিটি বা জাতীয়তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এঁদের আমরা 'সাংস্কৃতিক নির্ণয়বাদী' বলতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের আলোচিত গ্রন্থ *দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম* (১৯০৪-৫)-এর একটা বড় যুক্তি হচ্ছে এই যে, উত্তর ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ ও সাফল্যের কারণ হচ্ছে পিউরিটান এথিকস। ভেবার ধর্মের সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতির প্রসঙ্গ, অর্থাৎ ধর্মের সমাজতত্ত্ব, আরও তিনটি বইয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্মকে আমরা যদি সংস্কৃতি বলে মানি, তাহলে ভেবারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট—সংস্কৃতির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। (স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর বহুল আলোচিত 'থার্ড ওয়েভ অব ডেমোক্রেসি' তত্ত্বে বলেন যে প্রোটেস্ট্যান্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশ দেশেই ১৯৭০-এর আগেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হান্টিংটন, ১৯৯১)। একই ধরনের কথা ইউরোপের বাইরের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন অনেক সমাজতত্ত্ববিদ। যেমন গোটা পূর্ব এশিয়া, বিশেষত চীনা সমাজে পদসোপানের বা হায়ারার্কির গ্রহণযোগ্যতা এবং রাষ্ট্র গঠনে তাঁর ভূমিকা বিশদভাবে আলোচিত। বলা হয়ে থাকে যে এর পেছনে আছে কনফুসিয়ানিজমের

প্রভাব (শি, ২০০৮; চেন, ২০১৩)। অর্থাৎ সমাজে বিরাজমান মূল্যবোধ বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯০-এর দশকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের ব্যাখ্যা হিসেবে 'এশিয়ান ভ্যালুজ' বা 'এশীয় মূল্যবোধের' ধারণা প্রচার করা হয়েছিল (ইনুগুচি ও নিউম্যান, ১৯৯৭)। সাংস্কৃতিক নির্ণয়বাদের ওপরে এককভাবে নির্ভর করার বিপদ হচ্ছে এই যে তা ভুলভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এটি আমরা এশীয় মূল্যবোধের তত্ত্বে যেমন দেখি, তেমনি দেখতে পাই মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক আলোচনায়ও; হান্টিংটনের বহুল আলোচিত-সমালোচিত সভ্যতাসমূহের সংঘাত (ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস) তত্ত্ব এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (হান্টিংটন, ১৯৯৬)। কোনো কোনো বিশ্লেষক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিকে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলেই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ফলে এটা স্পষ্ট করে বলা আবশ্যক যে সমাজ পরিবর্তনে সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ বলার অর্থ এই নয় যে তা এককভাবে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ এবং সাংস্কৃতিক নির্ণয়বাদের সমর্থকেরা একার্থে এক জায়গায় একমত বলেই প্রতীয়মান : তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র নির্ণায়ক নয়, বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ফসল।

পরিবর্তনের নির্ণায়ক হিসেবে রাষ্ট্রকে একেবারে খারিজ করে দেওয়ার ধারণাকে তত্ত্বগতভাবে চ্যালেঞ্জ করেন মার্ক্সবাদীদেরই একাংশ; তাঁরা দেখান যে সাধারণভাবে রাষ্ট্র শ্রেণিস্বার্থের প্রতিভূ হলেও, অর্থাৎ অর্থনীতি নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করলেও, ব্যতিক্রম হিসেবে এমন পরিস্থিতি সম্ভব যেখানে রাষ্ট্র নিজেই আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন (বা স্বায়ত্তশাসিত) ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্রের অপেক্ষিক স্বাধীনতার এই ধারণার উৎস কার্ল মার্ক্স হলেও ইতালীয় মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী আন্তোনিও গ্রামসি তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা দেন (গ্রামসি, ১৯৭১)। অন্যান্য নিও-মার্ক্সবাদীরাও (যেমন পুলানসাস ও মিলিবান্ড, ১৯৭২) এই বিতর্কে অংশ নেন। এই আলোচনার পাশাপাশি ১৯৮০-এর দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন করে 'রাষ্ট্র' বিষয়ে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় (ইভান্স, রুয়েশমায়ার ও স্কচপল, ১৯৮৫), যার একটি কারণ হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি । তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে এসব দেশে রাষ্ট্রের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অন্যান্য তত্ত্ব এসব দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। পূর্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার (যেমন চিলির) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে রাষ্ট্র কেবল শাসনের উপকরণ নয়, রাষ্ট্র সমাজের শ্রেণি-কাঠামো বদলে দিতে পারে, এমনকি নতুন শ্রেণি তৈরি করতে পারে। এটা উল্লেখ্য যে রাষ্ট্র শ্রেণি তৈরি করতে পারে, এই ধারণা আগে শুধু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আলোচিত

হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক (যেমন হামজা আলাভি, ১৯৭২) বলেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র নতুন শ্রেণি তৈরি করতে পারে এবং করে। এসব আলোচনায় একটা বিষয় অনুপস্থিত থেকেছে তা হলো রাষ্ট্রের আদর্শিক ভূমিকা, অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজেই ভাবাদর্শ বা আইডিওলজি তৈরির হাতিয়ার হতে পারে। রাষ্ট্র নতুন আদর্শের জন্ম দিতে এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা দিতে সক্ষম (রীয়াজ, ২০০৫)। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে 'জাতীয় উন্নয়নের' আদর্শের নামে এবং লাতিন আমেরিকায় 'জাতীয় নিরাপত্তার' আদর্শের নামে রাষ্ট্রগুলো অপ্রতিনিধিত্বশীল ও অগণতান্ত্রিক, এমনকি কর্তৃত্ববাদী শাসনকে বৈধতা প্রদান করেছে।

এককভাবে রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থনীতিকে পরিবর্তনের নির্ণায়কের ভূমিকায় স্থাপন করলে রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহকে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার সুযোগ হয় এবং তাতে করে একধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। দুটি উদাহরণ আমার বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করবে। আমি এই দুটো উদাহরণ ব্যবহার করছি এসবের তাত্ত্বিক গুরুত্বের জন্য যেমন তেমনি বাংলাদেশের জন্য এগুলোর প্রাসঙ্গিকতার জন্যও।

প্রথমটি হচ্ছে সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'সেক্যুলারিজমের' একটি ধারণা বিস্তার লাভ করে যে সেক্যুলারিজম হচ্ছে সমাজ ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয়। এই বিবেচনার আলোকে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বলা হয় যে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাবে। সমাজের অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে 'আধুনিকায়ন' এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানীরা, যেমন অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, ম্যাক্স ভেবার, কার্ল মার্ক্স—সবাই ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় এই উপসংহার টেনেছেন যে সময়ের পরিক্রমায় সমাজে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব হারিয়ে যাবে। 'আধুনিকায়ন' ধীরে ধীরে ধর্মকে জনপরিসর থেকে বিদায় করবে, এটাই ছিল মূল যুক্তি। আধুনিকায়ন অবশ্যই কেবল অর্থনীতির বিষয় নয়, আধুনিকায়নের সঙ্গে জড়িত আছে 'মডার্নিটি'র বিষয়, যা আবার যুক্ত সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে (রীয়াজ, ২০১৬)। কিন্তু 'আধুনিকায়নের' যে সীমাবদ্ধ ধারণা সেক্যুলারিজমের বিস্তারের কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি এবং ক্ষেত্রবিশেষে একচ্ছত্র বলে প্রচারিত হয়েছিল তা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদই শেষ বিচারে সেক্যুলারিজমের ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এটি বিশেষভাবে ঘটে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রবক্তাদের কারণে।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আমরা দেখতে পেলাম যে সমাজ থেকে ধর্মের অবসান তো ঘটেইনি, বরং সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে

উঠেছে, তার প্রভাব বেড়েছে, রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদের আলোকে আমরা যদি ধরে নিই যে অর্থনৈতিকভাবে পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন একটি বিশেষ পথরেখা অনুসরণ করবে, সেটা সঠিক না-ও হতে পারে। ধর্মের নতুন ভূমিকা আমাদের সে ইঙ্গিতই দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কেবল আমাদের অনুমিত পথে এগোবে, এমন মনে করা বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণের পেছনে রাষ্ট্রেরও ভূমিকা থাকে। সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের উত্থান, বিশেষত 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোতে এ উত্থানের পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এটি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় যেখানে রাষ্ট্র নিজেই ধর্মকে সামনে নিয়ে এসেছে, সেখানেও প্রযোজ্য যেখানে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে (প্রাইভেট স্ফেয়ার) ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে (রীয়াজ, ২০১৬)।

আধুনিকায়ন তত্ত্বের আরেকটি বিষয় ছিল গণতন্ত্রের বিকাশের প্রশ্ন। আমি সেটিকেই দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। ১৯৬০-এর দশকে এই ধারণার ব্যাপক প্রচার শুরু হয় যে গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র আছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক গভীর। স্মরণ করা দরকার যে আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রবক্তারা এ ধারণার জনক এমন দাবি করা যাবে না, গণতন্ত্রের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি একার্থে অ্যারিস্টটলের, যিনি বলেছিলেন যে দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় মধ্যবিত্তের দরকার; তবে আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রবক্তারা যে একে আলোচনায় এবং নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন, সেটা অনস্বীকার্য। যোগসূত্রগুলোর বিভিন্ন দিকের সারসংক্ষেপ এই রকম—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার দরকার হয় না—অর্থাৎ কেবল ধনী দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে তা নয়, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে (যাকে বলা হয় 'লিপসেট হাইপোথিসিস')—এই সম্ভাবনার পেছনে কারণ হচ্ছে শিক্ষার প্রসার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং নাগরিকের আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে কর্তৃত্ববাদী দেশ ক্রমেই গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে (লিপসেট, ১৯৫৯ : ৮৩-৮৪); 'বুর্জোয়ারা না থাকলে গণতন্ত্র হবে না' (বেরিংটন মুরের উদ্ধৃতি 'নো বুর্জোয়াজি, নো ডেমোক্রেসি', মুর, ১৯৬৬); যেভাবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, (অর্থনৈতিকভাবে) উন্নত দেশে গণতন্ত্র টিকে থাকে (প্রেজওরস্কি, ১৯৯২)। পরবর্তী দশকগুলোতেও গণতন্ত্র, গণতন্ত্রায়ণ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের আলোচনায় মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিভিন্নভাবে আলোচিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আলোচনার দুটো ধারা সহজেই শনাক্ত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে একরৈখিক, অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন একরৈখিকভাবে চলে,

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। সিমোর লিপসেট (১৯৫৯), স্যামুয়েল হান্টিংটন (১৯৯১), রোনাল্ড গ্ল্যাসম্যান (১৯৯৫) এই ধারার প্রতিনিধি। অন্যদিকে যাঁরা মনে করেন সম্পর্কটি শর্তসাপেক্ষ, তাঁদের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অন্যান্য আর্থসামজিক ও আর্থরাজনৈতিক অবস্থা দিয়ে প্রভাবিত হয়। এই ধারার প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন ডেইল জনসন (১৯৮৫), হেগেন কু (১৯৯৭), আকেমগলু ও রবিনসন (২০০০) এবং ব্রুস ডিকেনসন (২০০৩)। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে রাজনৈতিক পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত ভূমিকা রাখলেও শ্রমজীবীরাই গণতন্ত্রায়ণের মূল শক্তি (রুয়েশমায়ার, স্টিফেন্স ও স্টিফেন্স, ১৯৯২)।

লক্ষণীয় এই যে এসব আলোচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারণা কার্যত অর্থনৈতিকভাবে—আয় ও সামাজিক অবস্থানের আলোকে—নির্ধারিত হয়েছে, যদিও মধ্যবিত্ত এ ধারণার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলোর সারাংশ বিবেচনায় নিয়ে চেন (২০১৩) দেখান যে এদের দুভাবে ভাগ করা যায়—সাবজেকটিভ (বিষয়ী/ধারণাপ্রসূত) এবং অবজেকটিভ (বৈষয়িক/বস্তুগত)। সাবজেকটিভ বা বিষয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয় যে শ্রেণি হচ্ছে একধরনের মানসিক অবস্থান, যা একজন মানুষের সামগ্রিক আত্মধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; সহজ ভাষায় একজন মানুষ নিজেকে মধ্যবিত্ত মনে করছেন কি না, নিজেকে সেভাবে বিবেচনা করেন কি না, তার ওপর নির্ভর করছে তাঁকে আমরা সেই শ্রেণিভুক্ত করব কি না। অন্যদিকে অবজেকটিভ বা বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা হচ্ছে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণি নির্ধারিত হয় কতগুলো সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে। এই সূচক নির্ধারণের দুটি ধারা রয়েছে—একটি হচ্ছে সংখ্যাতাত্ত্বিক বা পরিমাণবাচক (কোয়ান্টিটেটিভ), যেমন আয়, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি। অন্যটি হচ্ছে গুণবাচক (কোয়ালিটেটিভ), যেখানে বলা হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত হচ্ছে তারাই যারা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা তাদের অন্য শ্রেণিগুলো থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে (চেন, ২০১৪ : ৩২-৩৪)।

গণতন্ত্রের পক্ষে মধ্যবিত্তের এই ভূমিকা কেন, সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণত যে প্রধান কারণের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে বৈষয়িক লাভ। মধ্যবিত্ত যেহেতু সম্পদের মালিকানা ভোগ করে, সেহেতু তারা চায় যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক, যাতে করে খামখেয়ালি ব্যবস্থার শিকার হয়ে তাদের কিছু হারাতে না হয়। এই প্রেক্ষাপটে এটাও উঠে আসে যে মধ্যবিত্ত একধরনের মূল্যবোধ ধারণ করে, যার মধ্যে আছে আত্মসম্মানবোধ, যার দিকে গুণবাচক ধারার গবেষণাগুলো গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। শিক্ষায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে এবং অর্থনৈতিক

অবস্থানের কারণে তাদের পছন্দ হচ্ছে চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার লাভ করা। এই তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে গোড়াতে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত ইউরোপের উদাহরণ দেওয়া হতো। কিন্তু ১৯৮০-৯০-এর দশকগুলোতে বেশ কিছু অর্থনৈতিকভাবে সফল দেশে আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে সেসব দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং তাদের চাপের মুখেই গণতন্ত্রায়ণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। হান্টিংটন গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ বা থার্ড ওয়েভ অব ডেমোক্রেসির যেসব কারণ হাজির করেন তার একটি হচ্ছে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের বিকাশ। এসব আলোচনায় কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে এ ধারণাই দেওয়া হয় যে কোনো দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করে, তবে সেখানে গণতন্ত্রায়ণ ঘটে বা তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ওপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় যে প্রচলিত (কিন্তু একেবারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়) তত্ত্বগুলো বলছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হলে গণতন্ত্র এবং 'সেক্যুলারিজমের' একটি রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় বা তার সম্ভাবনা বাড়ে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির 'সাফল্য' এবং মধ্যবিত্তের বিকাশ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে, বিশেষত বাংলায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবসংক্রান্ত আলোচনায় এটা গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত যে বাঙালি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির—যে শ্রেণির সদস্যরা ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক, ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু—উদ্ভব হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরিপোষণে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যেই এই মধ্যবিত্তের বীজ নিহিত ছিল, কলকাতাকেন্দ্রিক 'বাবু' সম্প্রদায় শিক্ষা ও চাকরির সূত্রেই মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় অনুকূল্যেই মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে। কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, পূর্ব পাকিস্তানে যে মুসলিম মধ্যবিত্তের সূচনা সেটিও রাষ্ট্রের আনুকূল্যেই। একার্থে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের আইনি ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের পথ উন্মুক্ত করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটি ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দেড় দশক পর, কার্যত ১৯৬০-এর দশকে, সামরিক শাসক আইয়ুব খানের আমলে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যে অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে রাষ্ট্রপরিচালকেরা লাভ করেন, সেখানে মধ্যবিত্তের আকার ছিল ছোট, প্রধানত ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। এই মধ্যবিত্তের একটি অংশই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। অতীত অভিজ্ঞতা, শ্রেণিচরিত্র এবং বাস্তবতার আলোকে এই শ্রেণি তার বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়েছিল, রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেই

তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। সে কাজে সূচিত সাফল্যের গতিকে দ্রুততর করার কাজটি ঘটে ১৯৭৫-পরবর্তী সেনাশাসকদের হাত ধরে, যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে ১৯৯০ সালে যখন প্রত্যক্ষ সেনাশাসনের অবসান ঘটল, বাংলাদেশে তখন একটি মাঝারি আকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে (রীয়াজ, ২০০৫)। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অংশভূত বা ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজে শ্রেণিকাঠামোয়, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষেত্রে, কী ঘটেছে সেটা অনুধাবন করতে আমাদের তাকানো দরকার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সহজে দৃশ্যমান বিষয়গুলোর দিকে। গত কয়েক দশকে, বিশেষত ২০০১ সালের পর, অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে; গত দশকগুলোতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উত্থান-পতন এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কাছাকাছি থেকেছে, এই সময়ে দারিদ্র্যের হার কমেছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ২০১৬ সালের জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী ১ লাখ ১৯ হাজারের বেশি, যা সমাজে সম্পদের উপস্থিতির প্রমাণ দেয় (মানবজমিন, ২০১৬)। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এর একটি ধারা আমরা দেখতে পাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি অ্যাকাউন্টধারী ছিল মাত্র ৫ জন। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর শেষে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭ জনে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৯৮ জন। এরপর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪৩ জনে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালের জুনে কোটিপতির সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৯৪। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর শেষে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ হাজার ১৬২ জনে। এরপর অক্টোবর ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছিল ৮ হাজার ৮৮৭ জন। অর্থাৎ এ সময়ে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ হাজারে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরে, অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সালে বেড়েছিল ৫ হাজার ১১৪ জন। এ সময়ে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৯ হাজারের বেশি। পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে মোট কোটিপতির সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ৩৬৯ জন। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত বছরে দেশে মোট কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ১৯ হাজার ৩৬১ জনে (মানবজমিন, ২০১৭)।

বাংলাদেশের নগর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকেও এ কথা বলা সম্ভব যে অর্থনৈতিকভাবে অবস্থা আপাতদৃষ্টে ভালো। অর্থনৈতিক এই পরিবর্তনের ফলে দেশে যে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে, তা সহজেই বোধগম্য। এখন বিশ্বের সবচেয়ে

ধনীদের তালিকায় একজন বাংলাদেশিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন (ইত্তেফাক, ২০১৭)। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে সুইস ব্যাংকগুলোতে রাখা অর্থের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় বেড়েছিল সাড়ে ১০ শতাংশ। মোট পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫০৪ কোটি ১৯ লাখ ৯৫ হাজার টাকা (হোসেন, ২০১৬)। পরের বছর তা আরও বৃদ্ধি পায়। ২০১৬ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। 'আগের বছরের চেয়ে এ জমার পরিমাণ প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বা ২০ শতাংশ বেড়েছে' (মহাজন, ২০১৭)।

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ আরেকটি উদাহরণ হতে পারে (চিত্র ১)। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তৈরি করা হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৪ সালেই প্রায় ৯১১ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৭২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা (প্রথম আলো, ২০১৭)।

চিত্র ১ : বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ২০০৪-২০১৪ (বিলিয়ন ডলারে)

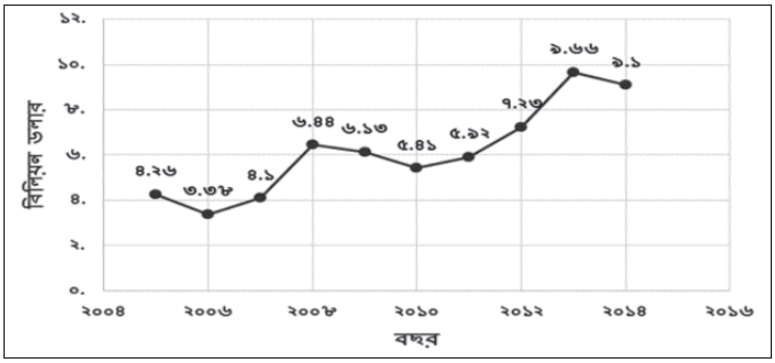

সূত্র : গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই)

এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে, যা আমরা জিনি সহগের মধ্যে দেখতে পাই। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ২০১৫ সালে এমডিজি প্রোগ্রেস রিপোর্টে জিনি সহগের আলোকে বলা হয়েছে যে জাতীয়ভাবে ২০০০ থেকে ২০১০ সালে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রায় স্থির থেকেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা বেড়েছে (শূন্য দশমিক ৩৯৩ থেকে শূন্য দশমিক ৪৩০)

(বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৫, ২৪)। রিপোর্টে আরও বলা হচ্ছে যে জাতীয় আয়ে দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ ভাগ কমেছে। ১৯৯১ সালে দরিদ্র ২০ শতাংশের ভাগ ছিল ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ, ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ, ২০০০ সালে ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ৫ দশমিক ২২ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের তুলনায় গরিব এক-পঞ্চমাংশ এখন আরও দরিদ্র হয়েছে। এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ বাস করছে (চিত্র ২ ও ৩)।

চিত্র ২ : জাতীয় আয়ে দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ ভাগ

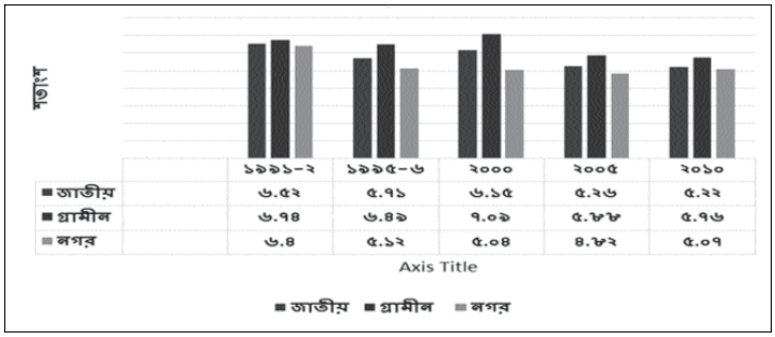

চিত্র ৩ : জাতীয় আয়ে গ্রামীণ দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ ভাগের ধারা, ১৯৯১-২০১০

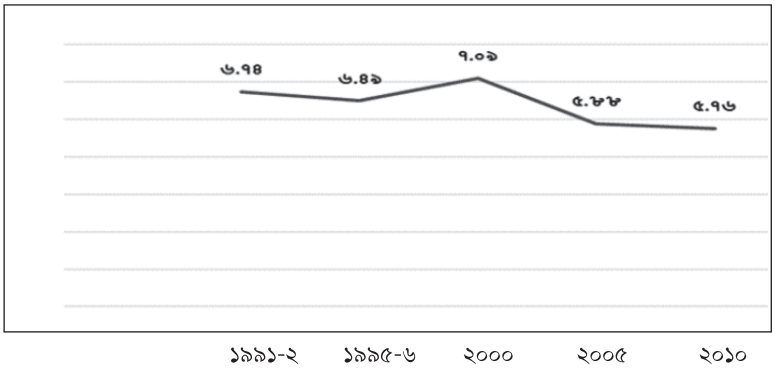

দেশে তরুণদের, বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের এক বড় অংশ, বেকার জীবন যাপন করছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ দুই বছরে মাত্র ছয় লাখ মানুষের কর্মসংস্থান

হয়েছে, অথচ এই সময়ে দেশের কর্মবাজারে প্রবেশ করেছে প্রায় ২৭ লাখ মানুষ। অর্থাৎ মাত্র দুই বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ লাখ। অথচ ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর চাকরি বা কাজ পেয়েছে ১৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষ (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০১৬, ইসলাম ২০১৭) (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ : নতুন কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১৫-১৬ (লাখের হিসেবে)

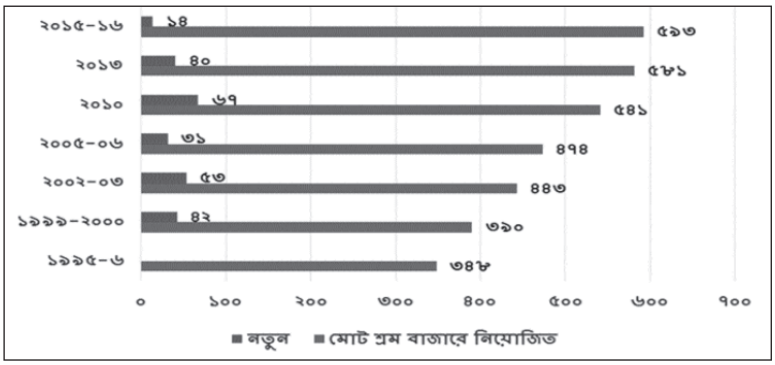

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোটা দাগের এসব অর্থনৈতিক তথ্যকে নিশ্চয় গ্রামীণ ও নগর—এভাবে ভাগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে আবারও সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বলতে পারি যে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেখানেও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে নতুন ও বিকাশমান মধ্যবিত্তের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা কেবল নগরকেন্দ্রিক নয়। কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সেখানেও নতুন মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক এসব প্রবণতার পাশাপাশি বিবেচ্য হচ্ছে সামাজিক সূচকগুলো। যেসব সামাজিক সূচক দিয়ে কোনো দেশের সাফল্য বিবেচনা করা হয়, যেমন শিশু, নবজাতক ও প্রসূতিমৃত্যুর হার, লিঙ্গসমতা, নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদানের হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার, সক্ষম দম্পতির জন্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গ্রহণের হার ইত্যাদি, সেখানেও বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের চেয়ে ভালো, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে পেছনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

এসব সূচকের সাফল্যের সঙ্গে যেমন অর্থনৈতিক দিক জড়িত, তেমনি জড়িত সমাজে বিরাজমান মূল্যবোধের। যেমন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি

খুঁটি হচ্ছে দেশের তৈরি পোশাকশিল্প। এই শিল্পের শ্রমিকগোষ্ঠী হচ্ছে নারীরা। পোশাক খাতে চল্লিশ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত এবং তার ৭০ শতাংশের চেয়ে বেশি হচ্ছেন নারী। এসব তথ্যকে মনে রাখলে আমরা অপ্রত্যক্ষভাবেই বলছি যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নারীর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা পরিবর্তন ঘটেছে, কেননা এই নারীদের এক বড় অংশই এসেছে গ্রামাঞ্চল থেকে। সেই পরিবর্তনের সূচনা সত্তর ও আশির দশকে এনজিগুলোর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের এই অংশগ্রহণের প্রভাব পড়েছে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের ওপরে। নারী শ্রমিকদের জীবনাচরণ কেবল যে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সীমিত থেকেছে তা নয়, তার প্রভাব পড়েছে তাঁদের নিজ নিজ পরিবার এবং যেখানে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা। একার্থে তাঁরা পরিবর্তনের প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। সমাজে পরিবর্তনের আরেক প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে স্বল্পমেয়াদি অভিবাসী জনগোষ্ঠী। ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক দশকে এক কোটির বেশি মানুষ (১,০৪,৫৬,৪১৮) স্বল্পমেয়াদি কাজের কারণে দেশের বাইরে গেছেন (এই হিসাবে ছাত্র, দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসন এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি) এবং দেশে ফিরে এসেছেন। অর্থনীতিতে এই জনগোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচিত হলেও তাদের সামাজিক ভূমিকা স্বল্পালোচিত।

এই প্রবণতাগুলোর দৃশ্যমান দিক হচ্ছে বিত্তের বিবেচনায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ, যার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে ভোক্তা ও বাজারের সম্ভাবনা বিচার করা এবং বিনিয়োগকারী ও বাবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া, ২০১৫ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৭ শতাংশ বা ১ কোটি ২০ লাখ হচ্ছে 'মধ্য ও বিত্তশালী ভোক্তা' ('মিডল অ্যান্ড এফলুয়েন্ট কনজিউমার'), এই ভোক্তা শ্রেণির বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১১-১২ শতাংশ; ফলে ২০২০ সালে তা দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশে, অর্থাৎ ১ কোটি ৯৩ লাখে; ২০২৫ সালে ৩ কোটি ৪০ লাখে (বিসিজি, ২০১৫)। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের গবেষক বিনায়ক সেনের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশকে মধ্যবিত্ত বলে বিবেচনা করা যায়, যা ২০২৫ সালে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশে (ডেইলি স্টার, ২০১৫)। তিনি বলছেন এক দশক আগে মধ্যবিত্ত ছিল ৯ শতাংশ, ২০৩০ সালে দাঁড়াবে ৩৩ শতাংশে (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০১৫)।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দিকগুলোর আলোচনা থেকে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আকারে বড় হয়েছে।

এখানে আমরা এই শ্রেণির বিত্তের সম্ভাব্য উৎসের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে (চিত্র ৫)। স্বাধীনতার আগের দশকে (১৯৬১-৭০) বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। গড়ে মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ৫৫ শতাংশ আসত কৃষি থেকে, সেবা খাতের অবদান ছিল ৩৫ শতাংশ, শিল্প খাতের অবদান ছিল ১০ শতাংশ। স্বাধীনতার প্রথম দশকে (১৯৭১-৮০) এই অবদান হয় যথাক্রমে ৪৫, ৪৪ ও ১১ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০—এক দশকের গড় হচ্ছে ৩২, ৫৬ ও ১২ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালে এই অবদান হয় ২৫, ৬০ ও ১৫ শতাংশ। লক্ষণীয় হচ্ছে সেবা খাতের বিকাশ। ২০০০ সালের পর আমরা এ ধারাকেই অব্যাহত থাকতে দেখি। ২০০১ থেকে ২০১১-এর দশকে গড় ছিল—কৃষি ১৮ শতাংশ, সেবা খাত ৫২ শতাংশ, শিল্প খাত ৩০ শতাংশ। ২০০০ সালে যেখানে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ, তা ২০১৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৫০ শতাংশে। সেবা খাতের অবদান ২৩ দশমিক ৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ১৪ শতাংশ, শিল্প খাত ৫২ দশমিক ৯১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অকৃষি খাতের অবদান বৃদ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

চিত্র ৫ : বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন, ১৯৬১-২০১৪

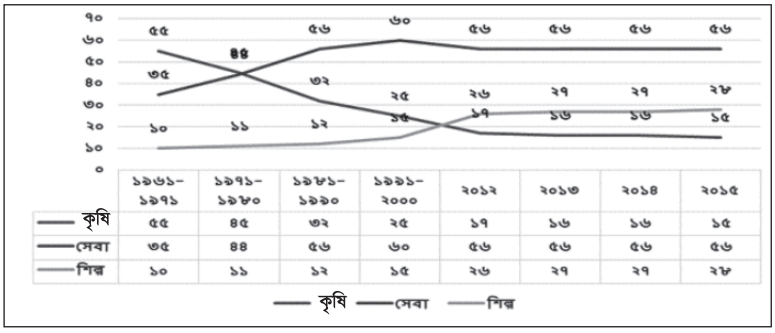

অর্থনীতির এই কাঠামোগত পরিবর্তনের চিত্র থেকে এটা অনুমান করা যায় যে গত দুই দশকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তাদের বিত্তের সূত্রের প্রধান উৎস হচ্ছে বিকাশমান সেবা খাত। বিআইডিএসের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে 'মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেসরকারি চাকরি করে। ২০ শতাংশ সরকারি চাকরি এবং ২২ শতাংশ ব্যবসা করে' (খালেক, ২০১৫)। এই

বেসরকারি চাকরির একটা বড় অংশই সেবা খাতের চাকরি। সেবা খাতের যে দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাব এবং বিশ্বায়নের ফলে তার বৈশ্বিক যোগাযোগ। এই দুই-ই এই শ্রেণির সদস্যদের বিশ্ববীক্ষা, মানস গঠন এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকায় প্রভাব ফেলবে বলে আমরা অনুমান করতে পারি।

মধ্যবিত্তের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা

রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পর্কবিষয়ক তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় শর্ত না হলেও কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা প্রদান না করলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি গণতন্ত্রের বিকাশের অনুকূল বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার বাইরে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস ও শিক্ষা তা-ই বলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, 'পাকিস্তানের যুগে শ্রমিক-কৃষকের ভাত-কাপড়-রুটি-রুজির দাবিতে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক-সামাজিক দাবিতে জনগণকে কম আন্দোলন করতে হয়নি। কিন্তু এসব আন্দোলনকে অতিক্রম করে আগাগোড়া প্রধান হয়ে সামনে হাজির হয়েছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য এবং বাঙালি জাতির জাতীয় অধিকার তথা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ইস্যু। এসব সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে। সে সময়কার জাতীয় সংগ্রামে ছাত্রসমাজের ছিল অগ্রণী ও প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা ছিল প্রধান' (সেলিম, ২০১৫)। একই কথা বলেছেন যতীন সরকার, 'দেশের মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল যাঁদের, তাঁদের গরিষ্ঠসংখ্যকই ছিল গ্রামের কৃষকসমাজের মানুষ। অর্থনৈতিক বিচারে এরা অধিকাংশই ছিল নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর, কারও কারও অবস্থান ছিল পুরোপুরি বিত্তহীনের কোটায়। কিন্তু সে সংগ্রামের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল না। মূলত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মানুষের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম' (সরকার, ২০১৬)। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিবিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোয়ও সুস্পষ্টভাবে এটাই চিহ্নিত যে বাংলাদেশের স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। তদুপরি ১৯৮০-এর দশকে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও এই শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু গত এক দশকে আমরা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি? একজন বিশ্লেষক বলছেন, রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে,

সেখানে গণতন্ত্র ও জবাবদিহি কীভাবে নিশ্চিত হবে, রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যাবে ইত্যাদি বিষয়েও সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমেই একধরনের নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে (খান, ২০১৬)। একই সময় সরকার-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের একাংশের কাছ থেকে 'গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের' ধারণা প্রচার ও তা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছে। এ ধারণায় একই সময়ে একদিকে 'জনগণের জন্য গণতন্ত্রের সব সুযোগ ও অধিকার' অব্যাহত রাখা এবং অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে (যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং তাদের সহযোগী সব শক্তির বিরুদ্ধে) একনায়কত্ব আরোপের এক নতুন শাসনব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে (হোসেন, ২০১৪)। এই ব্যবস্থার আওতায় নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার না রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে (হোসেনের ভাষায়, 'অনুচ্ছেদ ১৪১/সি-এর ক্ষমতাবলে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আরোপ করার অধিকার স্থগিত থাকবে।') একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতাসীনদের প্রতিপক্ষকে 'রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগ করেও দুর্বল ও নিঃশেষিত' করা এবং তাতে কোনো রকম বাধা না প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও যে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে 'বিভিন্ন আপসকামিতা, দুর্নীতি, অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা' উপস্থিত আছে (আকাশ, ২০১৫)।

এখানে এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে গত কয়েক বছরে বিশেষত ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটি বিভাজনরেখা টানা হচ্ছে এবং এদের পরস্পরের বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই উপস্থাপন করা হচ্ছে (চৌধুরী, ২০১৫; জাকারিয়া, ২০১৫)। এই ধারণার আলোকে ক্ষমতাসীন দল এবং তার সমর্থকদের বক্তব্য হচ্ছে যে প্রচলিত গণতন্ত্র রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, যা উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ, ফলে 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন'-এর পথই দেশের জন্য ইতিবাচক। এই ক্ষেত্রে তারা যেসব দেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে, তার মধ্যে আছে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের এই বিভাজন ও একটিকে অন্যটির বিকল্প হিসেবে উপস্থাপনের বিষয় নিয়ে বিতর্ক সুবিদিত। ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন বক্তব্যে প্রতিভাত হয় যে সেই বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে এবং এর অন্যান্য রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানের দিকগুলোকে ধর্তব্যে না নিয়েই 'উন্নয়নের' একটি বিশেষ ধারণাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বাংলাদেশে কথিত 'মালয়েশিয়া মডেল'-এর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (মাহমুদ, ২০১৪)। সরকারের এই অবস্থানকে স্বৈরতান্ত্রিক বলেও বর্ণনা করা হচ্ছে

(আমাদের বুধবার, ২০১৫)। একই সঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে যে লক্ষ্যসমূহ উল্লেখিত হয়েছিল তার সঙ্গে এ ধরনের অবস্থান মর্মবস্তুর দিকে থেকে সাংঘর্ষিক।

সাম্প্রতিক কালে আমরা বাংলাদেশের সমাজে, বিশেষত সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে, ধর্মের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি, যার প্রকাশ ঘটছে ধর্মাচরণকে জনসমক্ষে উপস্থাপনের মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাক্য, বাগ্‌ধারা, সম্ভাষণ থেকেও এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে। এর সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ হচ্ছে কিছু কিছু আরবি শব্দের ব্যাপক প্রচলন, যেমন বহুল প্রচলিত 'খোদা হাফেজ'-এর পরিবর্তে 'আল্লাহ হাফেজ'-এর ব্যবহার। তদুপরি বাংলাদেশে প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদেও এর প্রভাব দৃশ্যমান। একে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন 'আরবীকরণ' বলে (হাশমি, ২০১৪; হার্ডিগ ও সাজ্জাদ, ২০১৫)। এই নিবন্ধের শুরুতে যেটা আমি উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কয়েক দশকে ধর্মের প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পলেমিকাল বা একপাক্ষিক আলোচনার বাইরে ধর্ম ও রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে ভূয়োদর্শনলব্ধ আলোচনা খুব সীমিত। বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত, যাদের রেহমান সোবহান বর্ণনা করেছেন 'এক্সক্লুসিভ' এবং বিশ্বায়িত বা গ্লোবালাইজড বলে, তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি পক্ষপাতের বিষয়টি বিভিন্নভাবেই চিহ্নিত হচ্ছে। সোবহান মনে করেন, এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, যার মধ্যে 'সেক্যুলারিজম' অন্যতম, তাকেই জলাঞ্জলি দিয়েছেন (সোবহান, ২০০৬)। যতীন সরকার এই প্রবণতাকে 'পাকিস্তানীকরণ' বলে বর্ণনা করে মধ্যবিত্তকে 'মোনাফেক' বলে চিহ্নিত করেছেন (সরকার, ২০১৬)। এই দুই ধরনের ব্যাখ্যার কোনোটির সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে একমত না হয়েও বলা যায়, দেশে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ এখন সহজেই চোখে পড়ে।

কয়েকটি প্রশ্ন ও অনুমান

বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা (ইন্টেগ্রিটি) প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়া, ভিন্নমত প্রকাশের স্পেস সংকুচিত হওয়া, বিরাজমান একাধিক আইনের অপব্যবহার (যেমন তথ্য ও যোগাযোগ আইনের ৫৭ ধারা, যার আওতায় সরকার বা সরকারি দলের নেতাদের সমালোচনার জন্য আনীত মামলার সংখ্যা ২০১৬ সালে ছিল ৩৫টি), ভিন্নমত নিয়ন্ত্রণমূলক নতুন আইনের প্রস্তাব (যেমন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬), ক্রমবর্ধমান বিচারবহির্ভূত হত্যা (২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭৮) এবং গুমের

(২০১৬ সালে ছিল ৯০ জন) ঘটনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও (অধিকার, ২০১৭) এসব বিষয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যথেষ্ট উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এই থেকে এ প্রশ্ন তোলা যায় যে গত এক দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে কী অনুৎসাহিতা লক্ষ করা যাচ্ছে? গণতন্ত্র, এই প্রত্যয়ের কি ভিন্ন কোনো ধারণা তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে 'উন্নয়ন'কে গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে, তা কি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে? বাংলাদেশের গত কয়েক দশকে গণতন্ত্রের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, তাতে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই বিবেচিত হয়েছে, নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হারের দিকে তাকালেও এ বক্তব্যের সপক্ষে তথ্য পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের পর থেকে স্থানীয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষের ভোট প্রদানের প্রতিকূল পরিবেশ এবং ভোটাধিকার কার্যত অনুপস্থিত হওয়াকে তাঁরা কীভাবে বিবেচনা করেন? প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, '১৯৯২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে দেশে উল্লেখযোগ্য হারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে' (খালেক, ২০১৫)।

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক গঠন এবং বিশ্ববীক্ষা বিষয়ে গবেষণা চালানো জরুরি। আমরা কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ বা ইম্পিরিক্যাল উপাত্তের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের সঠিক জবাব আশা করতে পারি। এই প্রবন্ধের একটি লক্ষ্য হচ্ছে সে ধরনের গবেষণার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তার জন্য তাগিদ দেওয়া। আমি মনে করি যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ পথরেখা বোঝার জন্যই এ ধরনের গবেষণা জরুরি। এই পর্যবেক্ষণ যদি যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত গণতন্ত্রের, বিশেষত তার যে উদারনৈতিক দিকগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে অনাগ্রহী, তবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে যে ধরনের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যাকে 'দো-আঁশলা' গণতন্ত্র (বা হাইব্রিড রেজিম) বলেই বর্ণনা করা যায় (ডায়মন্ড, ২০০২) তা কেবল অব্যাহতই থাকবে না, বরং আরও শক্তিশালী হবে। অথবা বিপরীতক্রমে সমাজের অন্যান্য শ্রেণি, বিশেষত নিম্নবিত্তদের মধ্য থেকে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি হবে। সেই বিবেচনায় আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলাদেশে কি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক ভূমিকার অবসানের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে কি না।

একইভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশের মধ্যে জনসমক্ষে ধর্মাচরণের প্রচারের মধ্য দিয়ে কি ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার

বিভাজন না থাকারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে সেক্যুলারাইজেশনের প্রক্রিয়া কখনোই শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু সমন্বয়বাদী ইসলামের যে ধারাটি প্রধান ধারা বলে বিবেচিত হতো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশই সম্ভবত এখন আর সেই ধারাকে বহন করে না। এই পরিবর্তনের পেছনে কারণগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গণতন্ত্র ও ধর্মের প্রশ্নে মধ্যবিত্তদের আচরণ বিষয়ে এসব পর্যবেক্ষণের অর্থ এই নয় যে গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্যই তা প্রযোজ্য। অবশ্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে একটি অংশ দৃশ্যত ভিন্ন আচরণ করে এবং তারা ঐতিহ্যগত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট। কিন্তু গত এক দশকের বেশি সময়ের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি এই অনুমান করি যে এসব প্রশ্নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরে একটা বড় ধরনের বিভক্তি তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গত এক বা দেড় দশকে মধ্যবিত্তদের যে অংশের বিকাশ ঘটেছে, যাদের আমি 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি' বলে বর্ণনা করতে চাই, তাদের ভেতরেই গণতন্ত্রের উদারনৈতিক দিকগুলোর আবেদন কম এবং একই সঙ্গে তাদের মধ্য থেকেই সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য ভূমিকার তাগিদ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নতুন ও পুরোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই পার্থক্য বোঝার জন্য আমি ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বর্দোর 'সাংস্কৃতিক পুঁজি'র ধারণাকে ব্যবহার করতে চাই (বর্দো, ১৯৮৬)। বর্দোর আলোচনার প্রেক্ষাপট ফ্রান্স এবং তাঁর প্রধান বিবেচনা হচ্ছে শিক্ষা। বর্দো তাঁর 'ফর্মস অব ক্যাপিটাল' শীর্ষক নিবন্ধে দেখান যে পুঁজি হচ্ছে তিন ধরনের—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। সাংস্কৃতিক পুঁজি বলতে তিনি বোঝান এমন সব প্রতীকী বা সিম্বলিক জিনিস (যেমন দক্ষতা, রুচি, আচার, পোশাক, পার্থিব জিনিসপত্র, শিক্ষা ইত্যাদি), যা একজন মানুষ অর্জন করে একটি শ্রেণির অংশ হিসেবে। বর্দো বলেছেন যে সাংস্কৃতিক পুঁজির তিনটি রূপ আছে—এমবোডিড (অর্থাৎ একেবারে অন্তর্গত, যেমন উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি); অবজেকটিফাইড (অর্থাৎ বস্তুগত, যেমন গাড়ি বা শিল্পকর্ম), আর ইনস্টিটিউশনালাইজড (বা প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষা বা ডিগ্রি, যা সমাজে গৃহীত)। কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক পুঁজি কে পাবেন, সেটা কীভাবে নির্ধারিত হয়? বর্দো সেটা ব্যাখার জন্য 'হ্যাবিটাস'-এর ধারণা প্রবর্তন করেছেন। তিনি বলছেন যে হ্যাবিটাস সাংস্কৃতিক পুঁজির বৈষয়িক (বা ফিজিক্যাল) দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; ব্যক্তির জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাই ব্যক্তির রুচি, অভ্যাস, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে দেয়। আমি তাঁর বক্তব্যকে আরও সম্প্রসারিত করে বলতে চাই, একটা কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটে তা নয়, একটি শ্রেণির ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, একটা শ্রেণি কী ধরনের 'হ্যাবিটাসের' মধ্যে তৈরি

ও বিকশিত হয়েছে সেটা ওই শ্রেণির সদস্যদের বিশ্ববীক্ষা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় বলে আমি মনে করি।

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের মধ্যবিত্তবিষয়ক আলোচনায় এই সাংস্কৃতিক পুঁজির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী ব্রিটেনের বাইরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হচ্ছে 'মানব, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পুঁজি' (ইসলাম, ২০১৪)। তিনি মনে করেন যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলাতে শুরু করেছে ১৯৮০-এর দশকে, যখন ব্যাপকাকারে মধ্যবিত্তের একাংশের উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসন এবং একটি ছোট অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ ব্যবহার করে উঁচু শ্রেণিতে উঠে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এর ফলে একটা শূন্যতার সূচনা হয়। সেই জায়গাটিতে আসেন গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষ, যাদের মানসম্পন্ন শিক্ষার এবং 'সফিসটিকেশনের' অভাব আছে। তাঁরা অবশিষ্ট পুরোনো মধ্যবিত্তদের 'নিমজ্জিত' করে ফেলেন। তিনি বলেন যে এখনো শিক্ষা (ডিগ্রির বিবেচনায়) এবং পেশার (মূলত ব্যবসা) গুরুত্ব আছে, কিন্তু সেগুলো আর নির্ণায়ক বিষয় নয়। আয় এবং সম্পদ, যা সম্প্রতি অর্জিত হয়েছে, তাই এই বিকাশমান মধ্যবিত্তের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে এবং সেগুলো পুরোনো মূল্যবোধ ও সেক্যুলার সংস্কৃতির জায়গাগুলো নিয়ে নিচ্ছে' (ইসলাম, ২০১৪, ১১)। ইসলামের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আমি এখানে একমত যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমার এখন আরও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার ভিন্নমত হচ্ছে সময়ের বিবেচনা। আমি অনুমান করি যে এই পরিবর্তন হয়েছে ১৯৯০-এর দশকের পরে।

এই বিষয়ে সেলিম জাহানের প্রস্তাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভাজন আমাদের মনোযোগ দাবি করে (জাহান, ২০১১)। জাহান বলছেন যে গত কয়েক দশকে বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ফলে ঐতিহ্যগতভাবে যে শ্রেণিকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলে জানতাম, তাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি হয়েছে। এর এক অংশকে জাহান বলছেন 'সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি', অন্যটিকে বলছেন 'অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি'। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল, তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'সাধারণ জীবনযাপন, উঁচুমাত্রার চিন্তাভাবনা'। এই শ্রেণি কিছু আচারপদ্ধতি এবং মূল্যবোধ ধারণ করে। সমাজের ক্রান্তিকালে এই সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এবং সমাজের অন্য শ্রেণি, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণি, তাদের ওপর আস্থা রেখেছে। বিপরীতক্রমে যে নতুন 'অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি'র বিকাশ ঘটেছে, তারা প্রধানত বয়সে তরুণ, উচ্চশিক্ষিত ও পেশাজীবী। কিন্তু

সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেসব মূল্যবোধ ও আচারকে গুরুত্ব দিত, তাকে একইভাবে গুরুত্ব দেয় না। 'তারা অর্থের দ্বারা চালিত এবং ব্যবসা ও ভোক্তাবাদ তাদের মননের অংশ' (জাহান, ২০১১ : ৫)। তিনি বলছেন যে এদের 'নতুন ধনিক' বলে অভিহিত করা হয়। জাহানের এই পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব দেশকে ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তাঁর এই পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের জন্য সমপরিমাণে সত্য। তবে অন্যত্র যেমন এই নতুন শ্রেণি মধ্যবিত্তরা তরুণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

এই বিবেচনায়ই আমি এই অনুমান বা হাইপোথিসিস আকারে উপস্থিত করছি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বদলের ফলে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, সেটাই সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের অন্যতম বিষয়। পাশাপাশি এই প্রশ্নও রাখতে চাই তা হলো এই নতুন মধ্যবিত্তের ভৌগোলিক অবস্থান (নগর বনাম মফস্বল বনাম গ্রাম) কিংবা তাদের পেশার কারণে তাদের বিশ্ববীক্ষা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো ধরনের পার্থক্য ঘটে কি না।

উপসংহারের পরিবর্তে

আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে এই নিবন্ধে আমি কোনো উপসংহার টানব না। কেননা, আমি এই লেখায় আমার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু অনুমান (হাইপোথিসিস) এবং প্রশ্ন উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র বোঝার জন্য এই দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাগিদ সৃষ্টি। এতে করে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা উপলব্ধি করা সহজ হবে বলে আমি মনে করি। এ ধরনের গবেষণা ও আলোচনা একাডেমিক গবেষণায় যুক্তদের জন্য যেমন কাজে দেবে, ঠিক তেমনি তা নীতিনির্ধারকদেরও সাহায্য করবে। সমাজ পরিবর্তনে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের এবং শক্তিগুলোর জন্যও এ ধরনের আলোচনা সহায়ক বলে আমি মনে করি। কিন্তু এ ধরনের গবেষণা ও আলোচনার আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে পূর্বধারণার বৃত্তে নিজেদের সীমিত না রাখা। অর্থাৎ অতীতে আমরা যাকে নিশ্চিত বলেই মনে করেছি, এমনকি তা যদি তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে গবেষণালব্ধও হয়, সে বিষয়ে নতুন ধরনের ফলাফলের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখা। একই সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের মধ্যকার গভীর এবং মিথোজীবী (সিম্বায়োটিক) সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়াও এই আলোচনার একটি জরুরি দিক। এর যেকোনো একটি

অপরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম, সেটি বিবেচনায় না রাখলে পরিবর্তনগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নিবন্ধের খসড়া ভাষ্যটি পাঠ করে মন্তব্য করার জন্য অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং ডক্টর সেলিম জাহানের কাছে লেখক আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র

Acemoglu, Daron and James A Robinson. 'Why Did the West Extend the Franchise: Democracy, Inequality and Growth in Historical Perspective.' *Quarterly Journal of Economics*, 115 (4), 1167-1199.

Alavi, Hamza, 'The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,' *New Left Review* I(74), July-August, 1972.

Bangladesh Planning Commission, *Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015*, General Economics Division, Dhaka: Bangladesh Planning Commission, September 2015.file:///C:/Users/aliri/Downloads/MDGs%20Bangladeh%20Progress%20Report_%20PDF_Final_September%202015.pdf

Boston Consulting Group (BCG), *Bangladesh:The Surging Consumer Market Nobody Saw Coming*. Boston: BCG, 2015. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/center-customer-insight-go-to-market-strategy-bangladesh-surging-consumer-market/

Bourdieu, Pierre. 'The Forms of Capital' in J E Richardson (ed.). *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education* (1986), New York: Greenwood Press, pp. 241-58. 1985.

Chen, Jie. *A Middle Class Without Democracy: Economic Growth and the Prospects for Democratization in China*. New York: Oxford University Press, 2013.

Chowdhury, Anis. 'Democracy and Development', *bdnews24.com.* 20 August 2015
http://opinion.bdnews24.com/2015/08/20/democracy-and-development-2/

Daily Star. 'Bangladesh's middle-class expanding', *Daily Star*, 6 November 2015.

Dhaka Tribune. 'BIDS: Middle-class people to reach 33% by 2030', *Dhaka Tribune,* 6 November 2015.

Diamond, Larry. 'Thinking about Hybrid Regimes,' *Journal of Democracy*, 13(2): 21-35, 2002.

Dickenson, Bruce. *Red Capitalist in China: The Party, Private Entrepreneurs, and Prospects of Political Change*. New York: Cambridge University Press.

Evans, Peter B. Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol. *Bringing the State Back In,* Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Frank, Andre Gunder. *Latin America:Underdevelopment or Revolution*. Monthly Review Press, 1969.

... Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Monthly Review Press, 1967.

... The Development of Underdevelopment. Monthly Review Press, 1966.

Glassman, Ronald M. *The Middle Class and Democracy in Socio-Historical Perspective*. Leiden, the Netherlands: E J Brill, 1995.

Härdig, Anders C. and Tazreena Sajjad. 'Between the Secular and the Sacred : The Changing Role of Political Islam in Bangladesh' Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/hardigsajjadpaper final_0.pdf 2015.

Hashmi, Taj 'Arabisation of Bangladesh: An Asset, Liability or Threat?' *Daily Star*, July 14, 2015

Huntington, Samuel. *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

... The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Touchstone, 1996.

Inoguchi, Takashi and Edward Newman (eds.). '*Asian Values*' *and Democracy in Asia*. Tokyo: United Nations University, 1997. http://archive.unu.edu/unupress/asian-values.html

Islam, Nazrul. 'Beware, the Middle Class is being Hijacked by the World Bank!' *Bangladesh e-Journal of Sociology*. 11 (2), July 2014.

Jahan, Selim. 'The Middle Class: Engine for New Development,' Working Paper 15, Poverty Division, Bureau for Development UNDP. New York: UNDP, September 2011.

Jamal, Eresh Omar. 'Can Bangladesh become an economic powerhouse?' *Daily Star*, 16 February 2017, http://www.thedailystar.net/opinion/ the-overton-window/can-bangladesh-become-economic-powerhouse-1361704

Johnson Dale E. 'Class and Social Development: Toward a Comparative and Historical Social Science' in *Middle Classes in Dependent Countries*, ed. Dale E Johnson, 13-41, Beverley Hills, CA : Sage Publications. 1985.

Lipset, Seymour.'Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy,' *The American Political Science Review*, Vol. 53, No. 1 (March): 69–105. 1959.

Koo, Hagen. 'Middle Classes, Democratization and Class Formation: The Case of South Asia, '*Theory and Society* 20 (4), 485-509, 1991.

Moore B, Jr. *The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press, 1966.

Odhikar. *Annual Human Rights Report 2016.* Dhaka: Odhikar. 2017.

Poulantzas, Nicos and Miliband, Ralph. 'The Problem of the Capitalist State.' In R. Blackburn, ed. *Ideology in Social Science: Readings in Critical Social Theory*. NY : Pantheon Books. pp. 238-262, 1972.

Przeworski, Adam. *Democracy and the Market*. Cambridge University Press, 1992.

Riaz, Ali. *Unfolding State: The Transformation of Bangladesh*. Ontario : de Sitter Publications, 2005.

... 'A Crisis of Democracy in Bangladesh,' *Current History*, Vol. 113, April 2014.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn H. Stephens, and John D. Stephens. *Capitalist Development and Democracy.* Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992.

Shi, Tianjian. 'China: Democratic Values Supporting an Authoritarian System,' in Yun-han Chu et al., eds., *How East*

Asians View Democracy. New York: Columbia University Press, 2008.

Sobhan, Rehman. 'Identity and Inclusion in the Construction of a Democratic Society in Bangladesh', *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, 51(2), 2006.

Wallerstein, Immanuel. *The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York/London: Academic Press 1974.

... The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press 1980.

— *The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's.* San Diego : Academic Press, 1989.

Weber, Max. *The Protestant ethic and the 'spirit' of capitalism and other writings.* Hammersmith, England: Penguin, 2002.

আকাশ, ড. এম এম, 'এই রাউন্ডেও কি শেখ হাসিনা জয়ী হবেন?' *সমকাল*, ১৬ মার্চ ২০১৫

আমাদের বুধবার, 'গণতন্ত্র নয় উন্নয়নের স্লোগান : স্বৈরতন্ত্রের জয়গান', *আমাদের বুধবার*, ২৯ জুলাই ২০১৫

ইত্তেফাক, 'সালমান এফ রহমান বিশ্বের ধনীদের তালিকায়' *ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ২০১৭

ইসলাম, রিজওয়ানুল, 'বাংলাদেশে কি কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে?' *প্রথম আলো*, ৪ জুন ২০১৭

খালেক, এম এ, 'মধ্যবিত্তের বিকাশ উন্নয়নের নির্দেশক', *যুগান্তর*, ১২ নভেম্বর ২০১৫

খান, আবু তাহের, 'মধ্যবিত্তের সামর্থ্য বৃদ্ধি বনাম ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ', *কালের কণ্ঠ*, ৩ নভেম্বর, ২০১৫

প্রথম আলো, 'এক বছরে ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার' *প্রথম আলো*, ৩ মে ২০১৭

বাংলাদেশ প্রতিদিন, 'দেশে বাড়ছে বেকারত্ব', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৬ এপ্রিল ২০১৬; আরও দেখুন ইসলাম, ২০১৭

মহাজন, সুজয়, 'সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ আরও বেড়েছে', *প্রথম আলো*, ৩০ জুন ২০১৭

মানবজমিন, 'দেশে কোটিপতির সংখ্যা ১১৯৩৬১' *মানবজমিন*, ২৫ নভেম্বর ২০১৬

মাহমুদ, ওয়াহিদউদ্দিন, 'উন্নয়ন, সুশাসন ও রাজনীতি মালয়েশিয়ার মডেল কি বাংলাদেশে খাটবে?' *প্রথম আলো*, ৬ নভেম্বর ২০১৪

জাকারিয়া, এ কে এম, 'আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র?' *প্রথম আলো*, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪

রীয়াজ, আলী, 'সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর', *প্রতিচিন্তা*, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৬

সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাচার', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর ২০১৫

সরকার, যতীন, 'মোনাফেক মধ্যবিত্ত ও বাংলাদেশের পাকিস্তানীকরণ', *রাইজিংবিডি ডটকম*, ৪ এপ্রিল ২০১৬

হোসেন, আনোয়ার, 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব', *বিডিনিউজ২৪*, ১০ জানুয়ারি ২০১৪, http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/14429

হোসেন, শওকত, 'সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ বেড়েছে সাড়ে ১০%', *প্রথম আলো*, ১ জুলাই ২০১৬

সমাজ

নার্স

শাহাদুজ্জামান

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধে আমি বাংলাদেশি নার্সদের অভিজ্ঞতা ও কাজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এটা একটা এথনোগ্রাফিক গবেষণার ভিত্তিতে করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে আমি এই গবেষণা চালিয়েছি। বাংলাদেশি সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো কীভাবে নার্সদের জীবনকে গড়ে দিয়েছে, এই গবেষণায় তা দেখানো হয়েছে। গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, নার্স তাঁদের কাজটা ভয়ভীতির সঙ্গে করছেন এবং সমাজে তাঁদের ভাবমূর্তি নেতিবাচক। অর্থাৎ সমাজ তাঁদের এবং তাঁদের পেশাকে খুব ভালো চোখে দেখে না। আমি এই নিবন্ধে বলতে চেয়েছি, নার্সিং যে একটি মহান পেশা—এই ভাবনা বাংলাদেশি নার্সদের মধ্যে আর কাজ করে না। এই ভাবনা থেকে তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন। বিশ্বের অন্যান্য অংশে নার্সরা যেভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তার সঙ্গে আমাদের দেশের নার্সদের দায়িত্ব পালনের কোনো মিল নেই।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বাংলাদেশ, এথনোগ্রাফি, নার্সিং, কর্মক্ষেত্র

ভূমিকা

২০০৫ সালে আমি এই গবেষণা চালাই। আমার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমটি হলো বাংলাদেশের একটি হাসপাতালে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা এবং বায়োমেডিকেল চর্চার স্থানীয় পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরা। দ্বিতীয়টি হলো যেভাবে বাংলাদেশি সমাজের মূল্যবোধ ও নিয়মগুলো হাসপাতালের জীবনে প্রভাব ফেলে তা দেখানো। গবেষণায় দেখা গেছে, কীভাবে বাংলাদেশের একটি হাসপাতাল একটি ক্ষুদ্র বিশ্বে পরিণত হয়েছে। গবেষণার জন্য আমি

---

* অনুবাদ : **রোকেয়া রহমান**

হাসপাতালের ওই ওয়ার্ডে আসা রোগী, তাদের আত্মীয়স্বজন, ওয়ার্ড বয়, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলেছি।

এই গবেষণা নিবন্ধে আমি বাংলাদেশি নার্সদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের জীবনকে গড়ে দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। মানবজাতির বিবরণ-সম্পর্কিত গবেষণার ঐতিহ্য অনুযায়ী ওয়ার্ডে বসে থেকে সেখানকার লোকজনের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার ভূমিকা ছিল একজন পর্যবেক্ষকের মতো। গবেষণা পরিচালনার জন্য আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও মতামতও নিয়েছি। তবে কাজ করতে গিয়ে আমাকে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে ওয়ার্ডে প্রবেশ এবং লোকজনের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টা খুব মসৃণ ছিল না। যদিও আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য হাসপাতালের মাত্র একটি ওয়ার্ডে কাজ করেছি, কিন্তু আমার ধারণা অন্য যেকোনো হাসপাতালে গেলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে।

সাদা শাড়ি

আমি গবেষণা চালিয়েছি ১০০ শয্যার একটি অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে। টারশিয়ারি পর্যায়ের এই হাসপাতাল এমন একটি এলাকায় অবস্থিত যেখানে ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩০ লাখ মানুষ বাস করে। যার ফলে ১০০ শয্যার ওয়ার্ডটিতে সব সময় ২০ থেকে ২৫ জন রোগী বেশি থাকে। তাদের স্থান হয় মেঝেতে। তোশক বিছিয়ে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে নার্সদের খুব সহজেই চেনা যায়, কারণ তাঁরাই একমাত্র স্টাফ যাঁরা কিনা ইউনিফর্ম পরেন। চিকিৎসকেরাও সাধারণত অ্যাপ্রোন পরেন না। নার্সদের অধিকাংশই নারী এবং তাঁরা সাদা শাড়ি এবং সাদা টুপি পরেন। পুরুষ নার্সরা সাদা শার্ট ও সাদা ট্রাউজার পরেন। নার্সরা বিভিন্ন রঙের বেল্ট পরেন। বেল্টের রং দেখে কারা সিনিয়র আর কারা জুনিয়র নার্স তা বোঝা যায়। আমার মাঠগবেষণার সময় ওই ওয়ার্ডে ১৮ জন নার্স পালাক্রমে কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পুরুষ নার্স। বাকি ১২ জন ছিলেন নারী। আমার মূল ফোকাস ছিল নারী নার্সদের ওপর। তবে দিনরাত মিলিয়ে নার্সদের উপস্থিতি সমান থাকত না। নার্সদের বেশির ভাগের আগ্রহ থাকত সকালবেলার শিফটের প্রতি। সকালে ওয়ার্ডে ৮ জন নার্স কাজ করতেন। বিকেলের শিফটে গড়ে ৪ জন। আর রাতের বেলায় ২ জন কাজ করতেন।

নার্সরা কাজ করেন নানা বসের অধীনে। নার্সিং সুপারভাইজার নার্সদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন এবং কী কী কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দেন। হাসপাতালের

মেট্রনের (তত্ত্বাবধায়িকা) কাছে নার্সদের জবাবদিহি করতে হয়। মেট্রন মাঝে মাঝে ওয়ার্ড পরিদর্শনে আসেন। নার্সদের কাজ তদারক করেন ওয়ার্ডের ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএ)। এ ছাড়া ওয়ার্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক নার্সদের কাজ তত্ত্বাবধান করেন।

বেশির ভাগ নার্স নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। বাংলাদেশের বেশির ভাগ নার্স হচ্ছেন হিন্দু। পর্দাপ্রথার কারণে বহু বছর ধরেই মুসলমান মেয়েরা ঘরের বাইরে কোনো কাজে যেতে পারেন না। তবে খ্রিষ্টান নার্সের সংখ্যাও কম। ডাক্তাররা মেয়ে নার্সদের 'সিস্টার' ও ছেলে নার্সদের 'ব্রাদার' বলে সম্বোধন করেন। রোগীরাও তাঁদের এসব নামেই সম্বোধন করেন। তবে অনেকে তাঁদের 'নার্স' বলেই সম্বোধন করেন।

রেজিস্টার, ফাইল ও ফরসেপ

মজার বিষয় হলো নার্সরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রোগীকে সেবা দেওয়ার চেয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজ ও রেজিস্টার খাতা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের মূল দায়িত্ব রোগীকে সেবা দেওয়ার কাজটি তাঁরা খুব কমই করেন। নার্সরা তাঁদের ডিউটি রুমে বিশেষ করে সকালবেলার পালায় রেজিস্টার খাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যেসব রেজিস্টার খাতা নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন সেগুলো হচ্ছে ১. অ্যাসাইনমেন্ট রেজিস্টার: ডিউটি নার্সদের প্রতিদিনের অ্যাসাইনমেন্ট এই রেজিস্টার খাতায় লেখা থাকে (নার্সিং সুপারভাইজার এই অ্যাসাইনমেন্ট লিখে থাকেন)।

২. রেকর্ড রেজিস্টার: এই রেজিস্টার খাতায় ওয়ার্ডে ভর্তি ও ওয়ার্ড থেকে ছাড়া পাওয়া রোগীদের নাম-ঠিকানা ও রোগের বিবরণ থাকে।

৩. হ্যান্ডওভার রেজিস্টার: এই রেজিস্টার খাতায় ওয়ার্ডের জিনিসপত্র যেমন: শিট, ম্যাট্রেস এবং অন্যান্য সরঞ্জামের নাম লেখা থাকে।

৪. রাউন্ড রেজিস্টার: ওয়ার্ড রাউন্ড দেওয়ার সময় চিকিৎসকেরা এই খাতায় উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

৫. প্যাথলজি রিকুইজিশন রেজিস্টার: রোগীর কী কী প্যাথলজি পরীক্ষা করা হবে তার তালিকা থাকে এই খাতায়।

৬. এক্স-রে রিকুইজিশন রেজিস্টার: যাদের এক্স-রে করা প্রয়োজন সেই রোগীদের তালিকা থাকে এখানে।

৭. স্পেশাল অ্যাটেনশন রেজিস্টার: কোনো রোগীকে যদি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে নার্সরা তা এই খাতায় লিখবেন পরবর্তী শিফটের নার্সদের জন্য।

৮. রেজিস্টার ফর পুলিশ কেস : পুলিশ কেস আছে এমন রোগীদের তালিকা থাকে এখানে (উদাহরণস্বরূপ : সড়ক দুর্ঘটনা বা অপরাধমূলক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি)।

৯. ডায়েট রেজিস্টার : বিভিন্ন রোগীর খাবারের তালিকা লেখা থাকে এই রেজিস্টার খাতায়।

১০. ড্রাগ রেজিস্টার : হাসপাতালে পাওয়া যায় এমন ওষুধের তালিকা থাকে এই খাতায়।

১১. রেজিস্টার ফর অ্যাবসকন্ডিং পেশেন্টস : ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে গেছেন, এমন রোগীদের তালিকা থাকে এই খাতায়।

১২. রেফারেল রেজিস্টার : অন্য হাসপাতালে বা বিভাগে পাঠানোর জন্য রেফার করা হয়েছে, এমন রোগীদের তালিকা থাকে এই খাতায়।

১৩. ডেথ রেজিস্টার : ওয়ার্ডে মৃত্যু হয়েছে এমন রোগীদের তালিকা থাকে এই খাতায়।

প্রতি সকালে একজন নার্সের ওপর দায়িত্ব থাকে একটি রিপোর্ট তৈরির জন্য। এই রিপোর্টকে বলা হয় 'মর্নিং স্টেটমেন্ট'। এই রিপোর্টে ওই দিন কতজন রোগী ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে তার সংখ্যা, তাদের কী কী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং আগের দিনে কতজনকে ওয়ার্ড থেকে ছাড়া হয়েছে ইত্যাদি লেখা হয়। এ ছাড়া এই রিপোর্টে কতজন রোগীর বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা আছে, কতজন রোগী ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে গেছে এবং কতজন মারা গেছে সেসব লেখা হয়। এই রিপোর্ট তৈরির সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্সকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হয়। নার্সরা এই রিপোর্টের কার্বন কপি করেন এবং হাসপাতালের পরিচালকের কার্যালয়, মেট্রনের কার্যালয় এবং ডায়েট রুমে পাঠান। নার্সিং সুপারভাইজার এটা নিশ্চিত করবেন যে এই রিপোর্ট প্রতি সকালেই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পাঠানো হয়েছে। তবে নার্সদের বেশির ভাগেরই কোনো ধারণা নেই এ রিপোর্ট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়। যখন আমি সুপারভাইজারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই তিনটি কার্যালয় এই রিপোর্ট দিয়ে কী করবে? তিনি উত্তর দিলেন, কে জানে? হয়তো তারা এটা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। সম্ভবত, তারা আমাদের কাজের মূল্যায়ন করতে চায়। আমার কাজ হচ্ছে নির্ধারিত অফিসে রিপোর্টটি পাঠানো। আমি এটা সময়মতো করার চেষ্টা করি। রিপোর্ট পাঠানো একটি তর্কাতীত নিয়ম। প্রতি সকালে একজন নার্স তাঁর কাজ শুরু করেন এই রিপোর্ট তৈরির মধ্য দিয়ে এবং একজন সুপারভাইজার তা নির্ধারিত কার্যালয়গুলোতে পাঠান। যদিও তাঁরা জানেন না, এই রিপোর্ট দিয়ে কী হয়।

একজন নার্সের দায়িত্ব হচ্ছে রেজিস্টার খাতা হস্তান্তর করা এবং নার্সরা এ নিয়ে খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স আগের শিফটের একজন নার্সের কাছ থেকে রেজিস্টার খাতা নিয়ে থাকেন। এরপর তিনি খাতাগুলো একের পর এক পরীক্ষা করেন এবং তাঁর শিফটের পুরো সময়টা তা যত্নে রাখার চেষ্টা করেন। এরপর পরের শিফটের নার্সের কাছে এসব রেজিস্টার খাতা হস্তান্তর করেন। কোনো খাতা যদি না পাওয়া যায় বা হারিয়ে যায়, তাহলে যে নার্সের দায়িত্ব ছিল রেজিস্টার খাতাগুলো যত্নে রাখা তাঁকে জরিমানা করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্সকে সাহায্য করার জন্য অন্য নার্সরাও রেজিস্টার খাতাগুলোর ওপর নজর রাখেন। নার্সরা মাঝে মাঝে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে তাঁরা রোগীর বিছানার কাছ থেকে ফরসেপ, কাঁচি বা সার্জিক্যাল ট্রে সরিয়ে রাখতে ভুলে যান এবং তখন জিনিসগুলো হারিয়ে যায় বা সুযোগ বুঝে ওয়ার্ড বয়রা এসব জিনিস চুরি করে। এমনও দেখা গেছে, হাসপাতাল ছাড়ার সময় রোগী এবং তার স্বজনেরা বিছানার চাদর চুরি করে নিয়ে গেছে। এ জন্য নার্সদের সব সময় এসব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

ওয়ার্ডে প্রফেসরদের দিনের রাউন্ড শেষ হওয়ার পর, কর্তব্যরত চিকিৎসক রাউন্ড রেজিস্টারে নতুন করে পরামর্শ ও কীভাবে চিকিৎসা দেওয়া হবে তার নির্দেশ দেন। এরপর রোগীর ফাইলে সেসব পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নার্সরা সব ফাইল তাঁদের ডিউটি রুমে নিয়ে যান এবং নতুন পরামর্শ ও নির্দেশগুলো পর্যালোচনা করেন এবং সে অনুযায়ী প্যাথলজি, এক্স-রে ও ডায়েট রিকুইজিশন রেজিস্টারে সেগুলো নথিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেফারেল স্লিপ তৈরি করেন, ওয়ার্ডে কী কী ওষুধ রয়েছে তা পরীক্ষা করেন এবং হাসপাতালের বাইরে থেকে কিনতে হবে এমন ওষুধের তালিকা তৈরি করেন। নার্সিং সুপারভাইজার তখন হাসপাতালের ওষুধের দোকানে প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য একটি রিকুইজিশন অর্ডার পাঠান এবং একজন মেডিসিন বয়কে পাঠান ওষুধগুলো নিয়ে আসার জন্য। নার্সরা কোনো রোগীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার দরকার থাকলে তা পরবর্তী শিফটের নার্সদের জন্য লিখে রেখে যান। কোনো রোগীর শরীরে যদি রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় বা স্যালাইন বদলানোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেসব কোন সময়ে করা হবে তা তাঁরা লিখে যান। আর কোনো রোগীর যখন অস্ত্রোপচার করা হবে, তখন নার্সদের রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠানোর আগে অতিরিক্ত বেশ কতগুলো ফরম পূরণ করতে হয়। তাঁদের এটাও নিশ্চিত করতে হয় যে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব কাগজপত্র রোগীর সঙ্গে আছে। এটা পরিষ্কার যে নার্সদের একটি বিরাট অংশের সময় কেটে যায় এসব রেজিস্টার, স্লিপ, ফাইল ও রিপোর্ট লিখতে লিখতে। এতে

করে তাঁরা একধরনের হতাশায় ভুগতে থাকেন।

এ ব্যাপারে একজন নার্সিং সুপারভাইজার বলেন, 'আমাদের নার্স নয়, কেরানি বলে ডাকা উচিত। সেই সকাল থেকে ফাইল, রেজিস্টার ইত্যাদি লেখা শুরু করি এবং সারা দিন তা চলতে থাকে। তাহলে কখন আমি রোগীর দেখাশোনা করব? আমি মনে করি পেপারওয়ার্ক করার জন্য আলাদা কর্মী দরকার। ১০ বছর আগে আমাদের কোনো পেপারওয়ার্ক করতে হতো না। আমার মনে আছে, আমরা তখন নিজ হাতে রোগীদের খাইয়ে দিয়েছি। রোগী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেপারওয়ার্কের পরিমাণও বেড়েছে। রোগীকে সেবা দেওয়ার মতো সময় আমাদের হাতে থাকে না।'

রোগীদের সংস্পর্শে আসা হয় খুবই কম

যখন নার্সিংয়ের ওপর শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাঁদের বলা হয় কী কী দায়িত্ব তাঁদের পালন করতে হবে। এগুলো হচ্ছে রোগীদের গ্রহণ করা, তাদের শরীরের উল্লেখযোগ্য চিহ্নগুলোর রেকর্ড রাখা, ওষুধ বিতরণ করা, রোগীদের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা, ড্রেসিং করা এবং ক্ষতস্থান ড্রেসিং করতে অন্য নার্সকে সহায়তা করা, রোগীর শয্যা প্রস্তুত করা, রোগীর খাবার পর্যবেক্ষণ করা, রোগীকে ব্যায়াম করানো ও ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অস্ত্রোপচারে সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি।

রোগীদের গ্রহণ করা মানে হলো যখন ওয়ার্ডে কোনো নতুন রোগী আসবে তখন নার্সরা সেই রোগীকে ওয়ার্ড বয়দের সহায়তা নিয়ে বিছানায় শোয়াবেন। এরপর তাঁরা নতুন রোগীর জন্য একটি ফাইল তৈরি করবেন। এতে তার নাম-ঠিকানা, রোগের বিবরণ থাকবে। তাঁরা ফাইলটি রোগীর বিছানার পাশে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং ডাক্তারের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন। ওয়ার্ডে যেসব ওষুধ পাওয়া যায় নার্সরা তা বিতরণ করবেন। তবে বাস্তবতা হলো হাসপাতাল থেকে খুব কম ওষুধই ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। বাকি ওষুধ রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হয়। নার্সরা রোগীদের বলে দেন কখন কোন ওষুধ কতবার খেতে হবে। তবে যা-ই হোক, আমি কখনো দেখিনি যে নার্সরা রোগীকে ওষুধ দেওয়ার দায়িত্বটি পালন করছেন। তাঁরা হয়তো রোগীর বিছানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেন, তিনি সময়মতো ওষুধ নিয়েছেন কি না। তাঁরা সত্যিই রোগী ওষুধ খেয়েছে কি না তা দেখেন না। তবে রোগীকে ইনজেকশন দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের খুব বিবেকবান হতে দেখা যায়। নার্সদের অনেকে ইনজেকশন দিতে পেরে গর্ববোধ করেন। তাঁরা এটা ভেবে আনন্দ পান যে রোগীর আত্মীয়স্বজন বা দেখভালকারীরা এই কাজটা পারেন না। একজন স্টাফ নার্স আমাকে বলেছেন,

'রোগীর আত্মীয়স্বজন ও দেখভালকারীরা আমাদের সব কাজ নিজেরাই করে ফেলে, কিন্তু ইনজেকশনের জন্য তাদের আমাদের ডাকতে হয়।'

রোগীর ক্ষতস্থান বা আঘাতের জায়গা সাধারণত শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা ড্রেসিং করে দেন। তখন নার্সরা তাঁদের সহায়তা করেন। তবে মাঝে মাঝে ডাক্তাররা ব্যস্ত থাকলে নার্সরাই ড্রেসিং করে দেন। তবে রোগীর চাপ যখন বেশি থাকে তখন ওয়ার্ড বয়রাও ড্রেসিংয়ের কাজ করেন। অপারেশন থিয়েটারেও নার্সরা সহায়তা করেন। তাঁরা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম এবং ডাক্তারদের গাউন প্রস্তুত করে রাখেন। এ ছাড়া রোগীর অস্ত্রোপচারের সময় মাঝে মাঝে তাঁরা ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেন।

সকালবেলা নার্সদের একজন রোগীর শয্যা প্রস্তুত করার দায়িত্ব পান। তিনি সাধারণত সহকারী নার্স বা শিক্ষার্থী নার্স হন। সত্যিকার অর্থে, তাঁরা শয্যা প্রস্তুত করতে তেমন কিছু করেন না। প্রফেসররা ওয়ার্ড রাউন্ড দিতে আসার আগে তাঁরা কেবল বিছানার চাদর পাল্টে দেন।

একজন শিক্ষার্থী নার্স বলেন, 'আমরা বইতে রোগীর শয্যা প্রস্তুতকরণের ব্যাপারে অনেক কিছু পড়েছি। যেমন : আর্থ্রাইটিসের রোগীর জন্য শক্ত বিছানা, পুড়ে যাওয়া রোগীর জন্য নৌকা আকৃতির বিছানা ইত্যাদি। কিন্তু কী করে আমি সেসব বিছানা প্রস্তুত করব? এখানে সব রোগীর জন্য বিছানা দেওয়া হয় না। অনেক রোগী তাই বাধ্য হয়ে মেঝেতে আশ্রয় নেন। এ ছাড়া যেসব বিছানা আছে সেগুলো খুবই পুরোনো। বেশির ভাগই ভাঙা। আমি শুধু দেখি বিছানার চাদরগুলো ঠিক আছে কি না।'

ওয়ার্ডে রোগীর খাবারের দেখাশোনা করাও নার্সদের দায়িত্ব। একজন নার্স ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রান্নাঘরে গিয়ে খাবারের ফরমাশ দেন। এসব খাবারের আবার কোড নম্বর আছে। যেমন ডায়েট ১ হচ্ছে রান্নাঘর থেকে প্রতিদিন যে খাবারটি আসে। ডায়েট ২ হচ্ছে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। ডায়েট ৩ হচ্ছে লবণমুক্ত খাবার। এই খাবার মূলত হাইপারটেনশন রোগীদের দেওয়া হয়। ডায়েট ৪ হচ্ছে চিনিমুক্ত খাবার। ডায়াবেটিসের রোগীদের এই খাবার দেওয়া হয়। ডায়েট ৫ হচ্ছে নতুন ভর্তি রোগীদের জন্য খাবার। রোগী ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার পরপরই তাকে এই খাবার দেওয়া হয়। ডায়েট ৬ হচ্ছে তরল খাবার। সত্যি কথা হচ্ছে এসব খাবার সব সময় পাওয়া যায় না বা রোগীদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দেওয়া হয় না।

একজন নার্স আমাকে জানান, কয়েক বছর আগে রোগীদের এক টুকরো রুটি ও এক গ্লাস দুধ দেওয়া হতো, যেটাকে আমরা অ্যাডমিশন ডায়েট বলি। কিন্তু এখন আর কোনো অ্যাডমিশন ডায়েট দেওয়া হয় না। রান্নাঘরে কোনো লবণমুক্ত

বা চিনিমুক্ত খাবার তৈরি হয় না। রোগীদের এখন দেওয়া হয় ডায়েট ১। এই খাবারটা সাধারণ খাবার বা কখনো কখনো তরল খাবার। মাঝে মাঝে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের ফরমাশ দিলে রোগীর সাধারণ খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত একটি ডিম দেওয়া হয়।

নার্সদের কখনো কখনো রোগীদের বা তাদের অ্যাটেনডেন্টদের কীভাবে ব্যায়াম করতে হয় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন নার্সরা ।

পাবলিককে সামলানোর জন্য আমাদের একা ছেড়ে দেওয়া হয়

ইংরেজি শব্দ পাবলিকের বাংলা করলে সাধারণত বিশৃঙ্খল জনগণকে বোঝায়। আর নার্সরা পাবলিক শব্দটি ব্যবহার করেন রোগী এবং তাদের স্বজনদের ক্ষেত্রে। নার্সরা মনে করেন, তাঁরা হচ্ছেন সেই জন যাঁদের পাবলিককে সামলানোর জন্য বাধ্য করা হয়। ডাক্তাররা রোগীদের থেকে দূরে থাকেন। এদিকে অধস্তন কর্মচারীরা চিকিৎসাসংক্রান্ত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। এর ফলে রোগী ও তার স্বজনেরা নার্সের কাছে এসে সবকিছু জানতে চান। বিকেল ও রাতের শিফটে রোগীদের সামলানোর কাজটি খুবই কঠিন, বিশেষ করে যখন জুনিয়র ডাক্তাররা ওয়ার্ডে থাকেন।

একজন নার্স বলেন, 'সকালবেলা রোগীরা ডাক্তারদের কোনো প্রশ্ন করতে ভয় পায়। যখন ডাক্তার ওয়ার্ড ছেড়ে চলে যান, তখন রোগীরা আমাদের কাছে এসে সব ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। তারা আমাদের তাদের এক্স-রে রিপোর্ট, রক্তের রিপোর্টসহ নানা রিপোর্ট দেখাতে চায়। আর বিকেল বা রাতের শিফটে ডাকার জন্য বা পরামর্শ করার জন্য কোনো ডাক্তার থাকেন না। কখনো কখনো দু-একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক থাকেন। তবে তাঁরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। পাবলিককে সামলানোর জন্য আমাদের একা ছেড়ে দেওয়া হয়।'

নার্সদের মতে, পাবলিককে সামলানো খুবই কঠিন একটি কাজ। রোগী ও তার স্বজনেরা নার্সদের চিকিৎসকের মতোই মনে করে। মাঝে মাঝে তারা এমন অবান্তর প্রশ্ন করে যে নার্সরা তখন ক্ষুব্ধ হন।

একজন নার্স আমাকে জানান, 'একদিন একজন রোগী আমাকে এসে বলল যে ক্যাপসুল তার শরীরে কোনো কাজ করছে না। আমার উচিত তাকে ইনজেকশন দেওয়া। কেননা ইনজেকশন অনেক শক্তিশালী। আরেক দিন আরেক রোগী আমাকে বলল, কেন তাকে আমি ছোট ট্যাবলেট দিয়েছি। পাশের বেডের রোগীকে তো বড় ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে। এ রকম কথা শুনলে কীভাবে আপনি আপনার মেজাজ ঠিক রাখতে পারবেন?'

আরেকজন নার্স আমাকে বলেন, 'একজন রোগী আমাকে হাসপাতাল থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন এনে দেওয়ার জন্য বলছিল। আমি তাকে বললাম, হাসপাতাল থেকে এ ধরনের কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয় না। কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করল না। বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগল ইনজেকশন এনে দেওয়ার জন্য। এটা হতাশাজনক।'

কিছু নার্স নার্সিং পেশার প্রতি তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একজন স্টাফ নার্স বলেন, 'নার্সিং পেশায় আপনাকে সব সময় পাবলিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আমি এটা ঘৃণা করি। এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ পাবলিক মাঝে মাঝে খুব হিংস্র হয়ে যায়, যখন তাদের চাহিদা পূরণ হয় না। আমি যদি স্কুলশিক্ষকের চাকরি নিতাম খুব ভালো হতো। তাহলে আমাকে এ ধরনের পাবলিককে মোকাবিলা করতে হতো না। এখন আমাকে শত রকমের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। শিক্ষক হলে শুধু ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে মিশতে হতো। এ ছাড়া সমাজে শিক্ষকতা পেশাটি মর্যাদাপূর্ণ।'

গোঁয়ার পাবলিককে এড়ানোর জন্য নার্সরা নানা কৌশল অবলম্বন করেন। মাঝে মাঝে তাঁরা ডিউটি রুম থেকে বের হয়ে যান। মাঝে মাঝে তাঁরা রোগী ও তাদের স্বজনদের কথায় কোনো কর্ণপাত করেন না। তবে তাঁরা সব সময় সতর্ক থাকেন, যেন পাবলিকের সঙ্গে তাঁদের কোনো ধরনের বিরোধ বা কলহ না বাধে।

একজন নার্স বলেন, 'রোগীর স্বজনেরা সব ধরনের অনুরোধ নিয়ে আমাদের কাছে আসে। কেউ বলে, স্যালাইনের ড্রিপটা মনে হয় ধীরে পড়ছে, একটু দেখুন না অথবা সিস্টার আমার রোগীর পেটে ভীষণ ব্যথা করছে, এদিকে একটু আসুন না। বেশির ভাগ সময় এগুলো মিথ্যা অভিযোগ। আমি চেষ্টা করি তাদের এড়িয়ে চলতে, কিন্তু যখন বুঝতে পারি তারা তাদের ধৈর্য হারাচ্ছে, তখন আমি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রোগীর পাশে যাই।'

যা হোক যেসব নার্স এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন, তাঁরা 'পাবলিক' যখন রেগে যায়, তখন তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে হয় তাঁরা চুপ থাকেন, নয়তো তাঁরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। ডাক্তার, ওয়ার্ড বয় বা ক্লিনারদের মতো পাবলিকের ওপর চেঁচামেচি করেন না বা তাদের বকাঝকা করেন না। নারী নার্সরা উপলব্ধি করেন যে তাঁরা রোগীর পুরুষ আত্মীয়স্বজনদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নন। আর রোগীর পুরুষ স্বজনেরাও আশা করেন যে নারী নার্সরা নারীদের মতোই আচরণ করবেন। বেশি চেঁচামেচি তাঁরা করবেন না।

একজন নার্স বলেন, 'আমি লোকজনের সঙ্গে কোনো ঝগড়ায় যাই না। এটা পুরুষশাসিত সমাজ। তারা মনে করে, কেন আমি একজন মহিলার কথা শুনব। মেয়েলোকে কী জানে?'

ডাক্তারই হচ্ছেন বস, কিন্তু...

হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী নার্সরা ডাক্তারের অধস্তন। ডাক্তাররা নির্দেশ দেন আর নার্সরা তা পালন করেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষ থাকায় নার্সরা নির্দেশ ঠিকমতো পালন না করলেও ডাক্তাররা নার্সদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন না। যদিও নার্সদের মূল্যায়নের জন্য ম্যাট্রন এবং পরিচালকেরা ডাক্তারের মন্তব্যের ওপর নির্ভর করেন। এটা খুব সাধারণ একটি দৃশ্য যে ডাক্তাররা নার্সদের ভুলের জন্য বকাঝকা করছেন, কিন্তু নার্সরা উচ্চবাচ্য না করে নীরব থাকেন। তবে কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে নার্সরা যখন বুঝতে পারেন ভুলটা তাঁদের নয়, তখন তাঁরা এ নিয়ে ব্যাপক রসিকতা করেন।

তবে জুনিয়র ডাক্তার বা শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের ক্ষেত্রে অবশ্য নার্সরা এমন সহনশীলতা প্রদর্শন করেন না। তাঁরা কখনো কখনো তাঁদের নির্দেশ অমান্য করেন। কখনো কখনো তাঁরা চিকিৎসা দেরি করে শুরু করার জন্য শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের অভিযুক্ত করেন। একদিন একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স একজন শিক্ষানবিশ ডাক্তারের উদ্দেশে বলেন, 'এই রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে দুপুর একটায়, এখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। এখন পর্যন্ত আপনারা রোগীকে দেখেননি। রোগী এখন আমার ওপর বিরক্ত। আপনি চিকিৎসা দিতে দেরি করেছেন অথচ রোগী আমার ওপর রেগে যাচ্ছে।'

আরেকটি ঘটনায়, ডাক্তার দেখার আগেই একজন স্টাফ নার্স নতুন ভর্তি হওয়া রোগীকে একটি অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেন। কর্তব্যরত শিক্ষানবিশ চিকিৎসক এতে খুব বিরক্ত হন। তিনি বলেন, 'কেন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস না করে রোগীকে ইনজেকশন দিলেন?' নার্স তখন উত্তর দিলেন, 'কতক্ষণ আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব? আমি জানি এই রোগীর খুব দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দরকার। আমি এখানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি।'

একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক আমাকে বলেছেন, 'নার্সরা যা করেন, তার তল পাওয়া কঠিন। ইন্টার্ন ডাক্তারদের নির্দেশ না মানাটা তাঁদের একটা প্রবণতা। একটি ফরসেপের জন্য আমাদের তাঁদেরকে তিনবার অনুরোধ করতে হয়।'

নার্স ও ডাক্তারদের মধ্যে আরও মারাত্মক সব দ্বন্দ্ব হয়। আমার মাঠগবেষণা শুরুর আগে অন্য একটি ইউনিটের একজন মেডিকেল অফিসার একজন নার্সকে তাঁর ভুলের জন্য চড় মারেন। এ ঘটনা এই হাসপাতালের নার্সদের মাঝে ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং প্রতিবাদে সব নার্স একযোগে ধর্মঘট ডাকেন। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ওই ডাক্তারকে অন্য বিভাগে বদলি করে দেয়। এতে নার্সরা সন্তুষ্ট হয়ে এক সপ্তাহ পর কাজে ফিরে আসেন।

নার্সদের অনুধাবন হচ্ছে তাঁরা ডাক্তারদের যে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করে থাকেন তা ডাক্তাররা স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে একজন নার্সের মন্তব্য হচ্ছে, 'প্রতিটি রোগীর তথ্য আমাদের কাছে থাকে। ওয়ার্ডের অবস্থা জানার জন্য ডাক্তারদের সব সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু আমরা পেপারওয়ার্ক করি, তাই ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানা থাকে। আপনি একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আপনাকে সব তথ্য দিতে পারবেন না। আমরা যদি অপারেশন থিয়েটারের জন্য একজন রোগীকে প্রস্তুত করে না দিই বা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজপত্র ঠিকমতো সরবরাহ না করি তাহলে ডাক্তাররা ওই রোগীর অস্ত্রোপচার করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরা আমাদের কোনো কৃতিত্ব দিতে চান না। তাঁরা মনে করেন, আমরা ফাঁকিবাজ।'

তবে নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের রসিকতাপূর্ণ গালগল্পও হয়ে থাকে। যদিও আমি কখনো দেখিনি কোনো নার্স গল্প করার জন্য ডাক্তারদের রুমে গেছেন। বরং ডাক্তাররাই নার্সদের রুমে আসেন গল্প করার জন্য। ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের প্রেম, ভালোবাসা এমনকি বিয়ের ঘটনাও শোনা যায়, যদিও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সমান নয়। তবে এটা খুবই বিরল। আমি যে ওয়ার্ডে গবেষণা চালিয়েছি সেখানে এ রকম কিছু হতে দেখিনি। তবে রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য করা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। একজন সিএ দুজন শিক্ষার্থী নার্সকে কড়া স্বরে ধমক দেওয়ার পর একজন নার্সিং সুপারভাইজার তাঁর উদ্দেশে বলেন, 'আপনি মেয়েদের প্রতি একেবারেই কঠিন। আপনার হৃদয়ে কিছু কোমলতা থাকা দরকার। প্রেম করেন, বিয়ে করেন। তখন আপনি শিখবেন কী করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।'

নার্সরা কোনো গ্ল্যামার গার্ল নয়

যদিও সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু নার্স এই পেশায় আসেন, তবে বেশির ভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ রোজগার করা। নিচের মন্তব্যগুলো পড়লেই তা বোঝা যাবে :

> আমরা পাঁচ বোন, কোনো ভাই নেই। আমার বাবা সব সময় ছোট চাকরি করেছেন। তাঁর পক্ষে স্বল্প আয় দিয়ে সংসার চালানো কঠিন ছিল। বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে আমি ভাবলাম, আমাকে টাকা রোজগার করতে হবে এবং বাবাকে সাহায্য করতে হবে। আমার বাবার পক্ষে আমাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। আমাদের সেই সময়ে নারীদের জন্য খুব বেশি চাকরির সুযোগ ছিল না। নার্সিং পেশাটাই ছিল সবচেয়ে ভালো।
>
> আমার একজন খালা নার্স ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে প্রায়ই হাসপাতালে আসতাম। এ সময় নার্সদের সাদা পোশাক দেখে আমার খুব ভালো লাগত। তখন আমি স্বপ্ন দেখতাম, আমি একদিন এই পোশাক পরব। আমার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল

না। তাই আমি চাইতাম আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে। আমার উচ্চশিক্ষা ছিল না। তাই আমি নার্সিং পেশাকেই বেছে নিয়েছি।

আমার বিয়ের দুই বছর পর আমার স্বামী মারা যান। এক বছরের বাচ্চাকে নিয়ে বাঁচার জন্য আমি চাকরি খুঁজতে থাকি। আমার যা শিক্ষা ছিল তাতে নার্সিং পেশাই আমার জন্য ঠিক মনে হয়েছে। একসময় আমি নান হতে চেয়েছিলাম। নার্সিং পেশা আমাকে সৃষ্টিকর্তার সেবা করারও সুযোগ এনে দিয়েছে। এটা আমাকে অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।

কিছু নার্স আমাকে বলেছেন, বহু বিধবা ও দুস্থ নারী নার্সিং পেশায় এসেছেন, কারণ এটা তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দিয়েছে। যদিও নার্সিং পেশায় আসার কারণে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ নার্স তাঁদের সামাজিক ভাবমূর্তিতে অসন্তুষ্ট। তাঁরা অনুভব করেন যে একই শিক্ষাগত যোগ্যতার অন্য পেশার লোকের তুলনায় তাঁরা কম মর্যাদা পান। তবে কিছু পুরুষ নার্স আবার এমনটা মনে করেন না। নারী নার্সরা তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে না দেখার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমটি হচ্ছে নার্সরা অনুভব করেন যে লোকজন মনে করে, নার্সিং একটি অনৈতিক পেশা, বিশেষ করে এ কারণে যে তাঁরা রাতের বেলা ডাক্তার ও অন্য পুরুষদের সঙ্গে হাসপাতালে অবস্থান করেন।

লোকজন মনে করে যে আমাদের কাজ শোভন নয়। আমরা রাতের বেলা কাজ করি। একজন মুসলিম নারীর জন্য রাতের বেলা বাড়ির বাইরে থাকা খারাপ। তারা মনে করে নার্সদের সঙ্গে ডাক্তার ও অন্য পুরুষ কর্মীদের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে নার্সদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়। আমার এক সহকর্মী নার্সের সঙ্গে একজন ডাক্তারের প্রেম হয় এবং তাঁরা বিয়েও করেন। কিন্তু ডাক্তারের পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি। তাঁর পরিবার বিয়েতে আসেনি। তাদের মতে, একজন ডাক্তারের একজন নার্সকে বিয়ে করা লজ্জার।

দ্বিতীয়ত, নার্সরা মনে করেন, লোকজন তাঁদের নিচু নজরে দেখে, কারণ তারা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে এবং নার্সিংয়ের কাজটিকে তারা নোংরা বলে মনে করে।

আমাদের একজন সহকর্মী বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য লন্ডন যান। তিনি দেখেছেন ধনী পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা নার্সিং পেশায় এসেছেন, তাই তাঁরা সম্মানিত হন। এখানকার লোকজন মনে করে, এসব মেয়ে দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন, নোংরা কাজ করে তাঁরা অর্থ উপার্জন করেন। সে জন্য তারা আমাদের কোনো দাম দেয় না।

সর্বশেষ, নার্সরা মনে করেন, যেহেতু ডাক্তাররা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নার্সদের দাম দেয় না তাই লোকজনও নার্সদের দাম দেয় না।

ডাক্তাররা সব সময় আমাদের লোকজনের সামনে বকাঝকা করেন। যখন সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের কাজ পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনিও সবার সামনে আমাদের বকা দেন। তাহলে কীভাবে লোকজন আমাদের দাম দেবে?

আলোচনা

আমার গবেষণায় যা পেয়েছি তা হলো নার্সদের কাজের সময়ের বেশির ভাগ কাটে পেপারওয়ার্ক করে। তাঁরা খুব কমই সেবা বা চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজ করেন। রিপোর্ট, রেজিস্টার খাতা আর ফাইল নিয়ে দৌড়াদৌড়িতে তাঁদের সময় কাটে। তাঁরা মূলত প্রশাসনিক রেকর্ড এবং ওয়ার্ডের সরঞ্জামের হেফাজতকারী। রোগীদের সেবা দেওয়ার কাজটি তাঁরা খুব কমই করেন। রোগীর দেখভালের কাজটি রোগীর আত্মীয়স্বজনেরাই করে থাকেন। রোগীদের কোনো আবেগগত সমর্থনও নার্সরা দেন না। তাঁদের চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজ ওষুধ বিতরণ, ইনজেকশন দেওয়া, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা এবং অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তারকে সাহায্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া কোনো ওয়ার্ডে রোগী গ্রহণের সময় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, ভর্তির পর কাগজপত্রে রোগীর সই নেওয়া, শয্যা প্রস্তুত করা, রোগীর খাবার পর্যবেক্ষণ করা এবং রোগীদের কোনো এক্সারসাইজের প্রয়োজন হলে তা করানোর কাজটি নার্সরা করে থাকেন।

আমার এই পর্যবেক্ষণ ২০০৭ সালে হ্যাডলি ও রকোয়েসের করা গবেষণার সঙ্গে মিলে যায়। ওই গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশি নার্সদের কাজের সময়ের মাত্র ৫.৩ শতাংশ তাঁরা সরাসরি রোগীর পেছনে ব্যয় করেন অর্থাৎ সরাসরি রোগীর সংস্পর্শে আসেন। হ্যাডলি ও রকোয়েস দেখেছেন, নার্সদের কাজের সময়ের ২২.৬ শতাংশ ব্যয় হয় পেপারওয়ার্ক করে, ৫০.১ শতাংশ ব্যয় হয় গল্পগুজব ও সেলাই ইত্যাদি কাজ করে এবং বাকি সময় ব্যয় হয় রোগীদের ওষুধ দেওয়া এবং ওয়ার্ডের নানা টুকটাক কাজে।

১৮ শতকের শেষ দিকে বিশ্বে নার্সিং পেশার উদ্ভব হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অবদানের কারণে নারীদের জন্য এই পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় আহত লোকজনকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার কারণে তাঁর নাম হয়েছিল 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প', যিনি কিনা একজন আদর্শ, নিবেদিতপ্রাণ, স্নেহময়ী, আত্মত্যাগী নারী। সেবাদানের ক্ষেত্রে যাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। নার্সরা যাতে এমন ভাবমূর্তি বজায় রাখেন সে জন্য পরে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে তুলে নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো।

কয়েক দশক আগে কোসার যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট হারমন হসপিটালের নার্সদের 'মায়ের মতো' হিসেবে অভিহিত করেন। তবে তিনি তখন নার্সদের সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা হয়তো এখনকার নার্সদের সঙ্গে পুরোপুরি মিল নেই। এখন তাঁরা অনেক বেশি পেশাদার। এখানে আবেগের জায়গা কম।

নার্সদের ইংরেজিতে বলা হয় সিস্টার। এই সম্বোধন দিয়ে এটা বোঝানো হয় যে নার্স এমন একজন ব্যক্তি, যিনি রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। একইভাবে 'অসুস্থের সেবা

করো' এবং 'শিশুর সেবা করো' বাক্য দুটি বোঝায় যে নার্স মানে এমন একজন ব্যক্তি, যিনি রোগীকে সেবা দেবেন, যে সেবায় থাকবে আবেগ।

গত কয়েক দশকে ব্রিটেনে নার্সদের ভূমিকা পর্যালোচনা করে আর্মস্ট্রং বলেন, ডাক্তারদের বিপরীতে ব্রিটেনের নার্সরা রোগীকে সেবাদানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি লিখেছেন, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি নিয়ে চলাফেরা করার কারণে রোগীরা অনেক সময় ডাক্তারকে বিপজ্জনক মনে করে। সে তুলনায় নার্সকে তাঁদের আপনজন মনে হয়। নার্সরা সব সময় রোগীর পাশে থাকেন, তাঁদের সব সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখেন এবং যত্ন নেন। ফলে রোগী ও নার্সের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিয়ার্ডউড, ওয়ালটারস, আইলেস এবং ফেঞ্চ (১৯৯৯) লিখেছেন, কীভাবে কানাডার নার্সরা রোগীদের আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের পেশাকে পুনর্গঠন করেছেন। এরপর থেকে তাঁরা আরও বেশি রোগীবান্ধব হয়েছেন। উলফ (২০০৬) লিখেছেন, রোগীদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নার্সদের আফসোস করতে দেখা গেছে।

যা হোক, পশ্চিমা দেশগুলোর নার্সদের এই ভাবমূর্তি আমাদের দেশের নার্সদের নেই। বেশ কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের নার্সদের ভূমিকা পশ্চিমাদের চেয়ে ভিন্ন। বাংলাদেশি নার্সরা তেমন ভূমিকায় থাকবেন তা সামাজিকভাবে বা অবকাঠামোগতভাবে সম্ভব নয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের নার্সদের ক্ষেত্রে 'অসুস্থকে সেবা করো' বা 'শিশুকে সেবা করো' এসব ধারণা এখন অনুপস্থিত। নার্সের বাংলা শব্দ হলো সেবিকা। এর অর্থ হলো যিনি সেবা দান করেন। কিন্তু বর্তমানে সেবিকা শব্দটিই আর উচ্চারণ হয় না। এখন নার্স আর রোগীর মধ্যে কোনো বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তা ছাড়া নার্স ও রোগীর অনুপাত এতই কম যে তাঁদের পক্ষে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সব রোগীর যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া হাসপাতাল থেকে তাঁদের যা সরবরাহ করা হয়, তা দিয়ে রোগীদের প্রতি মায়ের মতো যত্ন নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কর্মকার (১৯৯৩) লিখেছেন, ১৯৪৭ সালে ঢাকায় প্রথম সিনিয়র নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন ব্রিটিশ ম্যাট্রন এর প্রধান ছিলেন। ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ার পর মাত্র ৫০ জন নার্স ভারত থেকে এখানে আসেন। এ দেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত। এদের মধ্যে ৮ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৪৯ সালে লন্ডনে পাঠানো হয়। ফিরে আসার পর এই নার্সদের বেশির ভাগই নার্সিং সেবায় নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০ সালে প্রথম বাংলাদেশি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কয়েকটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও

পোস্টগ্র্যাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে এবং একটি পৃথক অধিদপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে পেশাদার নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর মূল তাৎপর্য ও চরিত্র হারিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন হাসপাতালগুলোতে আমলাতান্ত্রিকতা শুরু হলো তখন নির্ধারিত কাজের বাইরেও নার্সদের দিয়ে নতুন নতুন কাজ করানো শুরু হলো। যেমন: প্রশাসনিক কাজ, কেরানির কাজ ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশে এমনটি হচ্ছে প্রশাসনিক কাজে দক্ষ লোকবলের অভাবে। কর্মকার (১৯৯৩) দেখেছেন, নার্সদের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় পেপারওয়ার্ক করতে করতে। রোগীকে সেবাদানের কাজটি বলতে গেলে তাঁদের দিয়ে আর হয় না। এর ফলে তাঁরা আর রোগীদের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান না। রোগী এবং তার স্বজনদের অভিযোগও আর শোনা হয় না তাঁদের। ভ্যান ডনগেন ও এলেমা তাঁদের *বডিওয়ার্ক অব নার্সিং* বইতে নার্সদের কাজ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে বাংলাদেশের নার্সদের কাজের কোনো মিল নেই। নার্সিং পেশায় রোগীর সংস্পর্শে আসাটা খুবই জরুরি। কারণ রোগী তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যেমন মুখ-হাত ধোয়া, খাওয়া, বিছানা থেকে ওঠা, জামাকাপড় পরিবর্তনের জন্য নার্সদের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের নার্সরা খুব কমই রোগীর দেহ স্পর্শ করেন। সাধারণত রোগীর সঙ্গে থাকা স্বজনেরাই রোগীর এ কাজগুলো করে দেন। রোগীকে সুরক্ষা দেওয়া ও সহানুভূতি জানানোর কাজটি স্বজনেরাই করেন, নার্সরা নয়। এ ছাড়া এ দেশের নার্সরা রোগীদের সামাজিকীকরণের এজেন্ট নন বা তাঁরা চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যকার মধ্যস্থতাকারী নন, যা কিনা পশ্চিমা দেশগুলোর নার্সরা করে থাকেন। মাঝে মাঝে বাংলাদেশি নার্সরা অবশ্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ডাক্তারদের দেওয়া পরামর্শই আবার রোগীদের দেন। এটা খুব কমই দেখা যায় যে কোনো বাংলাদেশি রোগী নার্সদের সঙ্গে গল্পগুজব করার চেষ্টা করছেন।

সিয়োরটিনো (১৯৯২) ইন্দোনেশিয়ার নার্সদের এই পরিবর্তিত ভূমিকা দেখেছেন। তিনি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে নার্সদের আনুষ্ঠানিক এবং আসল ভূমিকার মধ্যে অমিল রয়েছে। রোগীকে সেবা দেওয়ার বদলে তাঁরা মূলত রোগীর চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অভাব থাকায় এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা এ কাজ করেন। নার্সিংয়ের কাজ বাদ দিয়ে তাঁরা রোগীর চিকিৎসা করেন। সিয়োরটিনো লিখেছেন, ইন্দোনেশিয়ার নার্সদের যা করা উচিত এবং যা তাঁরা শিখেছেন, তা তাঁরা করছেন না। ডিগবাই ও সুইট (২০০০) দক্ষিণ আফ্রিকার নার্সদের এই পরিবর্তিত ভূমিকা দেখেছেন। এটা দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে বাংলাদেশি নার্সরা তাঁদের পেশাকে

পশ্চিমা দেশগুলোর নার্সদের চেয়ে ভিন্নতর বিবেচনা করেন। বাংলাদেশের নার্সদের হতাশার সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে নার্স হিসেবে তাঁদের সামাজিক ভাবমূর্তি। নার্সিং পেশাকে এখানে সম্মানজনক বা মহান পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

বেগম ১৯৯৩ সালে দেখেছেন, বাংলাদেশের একমাত্র নার্সিং কলেজের ২০৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮০ শতাংশই তাঁদের এই নিম্ন সামাজিক মর্যাদা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নার্সদের সামাজিক মর্যাদা নিম্ন হওয়ার পেছনের কারণ হচ্ছে তাঁদের নিম্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। নার্সদের বেশির ভাগই আসেন দরিদ্র পরিবার থেকে। বেগম তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, নার্সদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসে দরিদ্র, কৃষিভিত্তিক পরিবার থেকে। এঁদের অনেকে বিধবা এবং নিঃস্ব বা সুবিধাবঞ্চিত, যাঁদের সামাজিক মর্যাদা নিম্ন। পেশাগত ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা নার্সদের তাঁদের অধস্তন বিবেচনা করেন (নাহার, ১৯৯১)।

বাংলাদেশে বিদ্যমান ধর্মীয় ধারণায়ও নার্সদের পেশা সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত উঠে আসে। হিন্দু ধর্মমতে, হিন্দু জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছে এমন এক ধর্মীয় নীতির ওপর, যেখানে শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই ধর্মে ক্রমাধিকারতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে 'অশুদ্ধের ওপর বিশুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব'। নার্সরা যে 'নোংরা কাজটি' করেন তা নিচু জাতের লোকেরাই করে থাকেন।

কিরকপ্যাট্রিক (১৯৭৯) আলোচনা করেছেন, ভারতে কীভাবে নার্সিং পেশাটা সামাজিকভাবে কলঙ্কজনক বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশি হিন্দু নার্সরা এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মুসলমান নার্সদের বেলায় চাকরির ধরনের কারণে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে হয়, যা কিনা নৈতিক দিক দিয়ে অবমাননাকর। একজন নার্স উল্লেখ করেছেন কীভাবে একজন চিকিৎসকের পরিবার অসম্মানিত বোধ করেছেন যখন তাঁদের ছেলেটি একজন নার্সকে বিয়ে করলেন। হারুন ও বানু আলোচনা করেছেন, কেন ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের মুসলমান নারীরা নার্সিং পেশায় আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

হ্যাডলি ও অন্যান্য (২০০৭) লক্ষ করেছেন, নার্সিং পেশার ব্রিটিশ মডেল এবং বাংলাদেশের সামাজিক নিয়মের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, রাতের পালায় কাজের কারণে নার্সদের অনেক অচেনা লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এ ছাড়া তাঁদের কাজকে 'নোংরা' হিসেবে বিবেচনা করায় নার্সরাও সমাজের কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত হন।

মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু মুসলিম দেশে একই অবস্থা দেখা যায়। এল সানাবারি (১৯৯৬) সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নার্সদের সামাজিক ভাবমূর্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন ওই সব দেশে নার্সদের

ভাবমূর্তি নেতিবাচক। ওই সব দেশের লোকদের ধারণা, নার্সরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, যেখানে তা করা নিষেধ। ওই সব দেশে সাধারণভাবে মনে করা হয়, নার্সরা নৈতিক দিক দিয়ে অসৎ এবং তাঁরা বিভিন্ন অবৈধ সম্পর্কে জড়িত।

এল সানাবারি লিখেছেন, অন্যদিকে পশ্চিমা সাহিত্যে নার্সদের পবিত্র এবং পুণ্যবান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নার্সদের সম্পর্কে মনোভাব এই পেশাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এই গবেষণায় আমি দেখিয়েছি বাংলাদেশি নার্সদের ভূমিকা, ভাবমূর্তি ও উদ্বেগ সম্পর্কে, যা নার্সিং পেশার যে আদর্শ ভাবমূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে অমিল রয়েছে। বিশ্বের আর সব দেশে যেভাবে নার্সিং পেশার চর্চা করা হয়, বাংলাদেশে সেভাবে চর্চা করা হয় না। বাংলাদেশি নার্সদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব নেই। 'লেডিস উইথ ল্যাম্প' ভাবমূর্তির বদলে তাঁরা বিরক্ত, হতাশায় পরিপূর্ণ নারী, যাঁরা কিনা রোগীদের সেবাদানের চেয়ে ফাইল ও রেজিস্টার খাতা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। নার্সদের এই পরিবর্তিত ভূমিকা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে জনশক্তি ঘাটতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে নার্সিং পেশার নেতিবাচক ভাবমূর্তি থেকে আমরা নারীদের নৈতিকতা এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সমাজের মূল্যবোধগুলো দেখতে পাই। এখান থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের সমাজ নারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ধারণাকে সমর্থন করে এবং কায়িক শ্রমকে কম সম্মান দেয়।

তথ্যসূত্র :

Armstrong, D. (1983). The fabrication of nurse-patient relationship. *Social Science & Medicine*, 17, 457-460.

Beardwood, B., Walters, V., Eyles, J., & French, S. (1999). Complaints against nurses: A reflection of the new managerialism and consumerism in health care? *Social Science & Medicine*, 48(3), 363-374.

Begum, C. S. (1993). *A study on nurses opinion about their own profession*. Dissertation. Dhaka, Bangladesh: National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM).

Coser, R. (1962). *Life in the ward*. East Lansing, MI: Michigan State University Press.

Digby, A., & Sweet, H. (2001). *Nurses as cultural brokers in twentieth-century South Africa*. In W. Ernst (Ed.), *Plural medicine, tradition and modernity 1800-2000*. London: Routledge.

Dumont, L. (1980). *Homo hierarchicus: The caste system and its implications*. Chicago: University Press. [Original French edition 1966]

Ehrenreich, B., & English, D. (1973). *Witches, midwives and nurses*. London: Writers & Reader Publishing Cooperative.

El-Sanabary, N. (1996). Women and the nursing profession in Saudi Arabia. In S. Sabbagh (Ed.), *Arab women: Between defiance and restraint*. New York: Olive Branch Press.

Hadley, M. B., Blum, L. S., Mujaddid, S., Parveen, S., Nuremowla, S., Haque, M. E., et al. (2007). Why Bangladeshi nurses avoid "nursing": Social and structural factors on hospital wards in Bangladesh. *Social Science & Medicine*, 64(6), 1166-1177.

Hadley, M. B., & Roques, A. (2007). Nursing in Bangladesh: Rhetoric and reality. *Social Science & Medicine*, 64(6), 1153-1165.

Harun, S., & Banu, A. (1991). Nursing in Bangladesh. *Journal of the College of Nursing, Bangladesh*, 1(1), 25-28.

Johnson, J. L. (1997). Generalizibility in qualitative research: Excavating the discourse. In J. M. Morse (Ed.), *Completing a qualitative project*. London: Sage.

Karmakar, R. (1993). *An assessment of nursing care provided by nursing staff personnel in a selected hospital*. Dissertation. Dhaka, Bangladesh: National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM).

Kirkpatrick, J. (1979). *The sociology of an Indian hospital*. Calcutta, India: Firma KLM Private.

Nahar, S. (1991). *A study of doctors' attitudes towards nurses in two hospitals of Dhaka*. Dissertation. Dhaka, Bangladesh: National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM).

Savage, J. (2000). Participative observation: Standing in the shoes of others? *Qualitative Health Research*, 10, 324-339.

Sciortino, R. (1992). *Caretakers of cure: An anthropological study of health centre nurses in rural central Java*. Bulaksumur India: Gadjah Mada University Press.

Simpson, I. H. et al. (1979). *From student to nurse: A longitudinal study of socialization*. Cambridge: Cambridge University Press.

Van der geest, S., & Finkler, K. (2004). Hospital ethnography: Introduction. *Social Science & Medicine,* 59(10), 1995-2001.

Van Dongen, E., & Elema, R. (2001). The art of touching: The culture of "body work" in nursing. Anthropology & Medicine, 8(2/3), 149-162.

William, S. M. (2002). Generalization in interpretative research. In T. May (Ed.), *Qualitative research in action*. London: Sage.

Wolf, Z. R. (2006). "Never again" stories of nurses: Dilemmas in nursing practice. *Qualitative Health Research*, 16, 1191-1206.

Zaman, S. (2005). *Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh*. Amsterdam: Het Spinhuis.

Zaman, S. (2008). Native among the natives: Physician anthropologist doing hospital ethnography at home. *Journal of Contemporary Ethnography*, 37(1), 135-154.

আন্তর্জাতিক

মিয়ানমারের মানবাধিকার আইকনের কী হলো?

হান্নাহ বিচ

২০১০ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা অং সান সু চিকে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি দেয়। সে সময়ে সু চি প্রায় দুই দশকব্যাপী পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সু চি আরেকজন সাবেক রাজনৈতিক বন্দীর কাছ থেকে অভিবাদনসূচক ফোন পেলেন। সেই সাবেক রাজনৈতিক বন্দী ভাক্লেভ হাভেল চেক প্রজাতন্ত্রের একজন ভিন্নমতাবলম্বী নাট্যকার, যিনি ১৯৮৯ সালে দেশটির প্রথম কমিউনিস্ট-উত্তর নেতা হয়েছিলেন। সেই ফোন কলটিই ছিল তাঁদের মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ কথোপকথন, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্ক সু চির বন্দিদশার পুরো সময়জুড়েই ছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দুই বছর পার হওয়ার পর ১৯৯১ সালে হাভেল সু চিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য নোবেল কমিটিতে সুপারিশ করেন। মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্বদানের স্বীকৃতি হিসেবে সু চিকে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য হাভেল চেষ্টা চালান। যখন সু চির একটি প্রবন্ধ বই প্রকাশিত হয়, সেখানে হাভেল ভূমিকায় বলেন, 'আমরা যারা ন্যায়বিচার অনুসন্ধান করি, তাদের সবার পক্ষ হয়ে সু চি কথা বলেন।'

দুনিয়াজোড়া এমন অনেক ভিন্নমতাবলম্বীর মধ্যে হাভেল ও সু চিও রয়েছেন, যাঁরা গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের

---

* অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

মাঝামাঝিতে মুক্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে আবির্ভূত হন এবং অনেকে সফলভাবে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করতেও সক্ষম হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা প্রায় ৩০ বছর কারাভোগের পর বর্ণবাদ প্রথা বিলোপ করতে সক্ষম হন এবং সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ওয়ারশতে লিচ ওয়ালেসা নামে একজন জাহাজ নির্মাণের কারখানা শ্রমিক এবং সলিডারিটি নামে একটি আন্দোলন কমিউনিস্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ফিলিপাইনেও ফার্দিনান্দ মার্কোসের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে যখন নিহত স্বৈরাচারবিরোধী একজন সমালোচকের বিধবা স্ত্রী করাজোন অ্যাকুইনো তাঁর স্বামীর সংগ্রামকে এগিয়ে নেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে সব সময় জয়ী হয়েছে এমন নয়। তিয়েনআনমেন স্কয়ারে ছাত্র আন্দোলনে চীন সরকারের চালানো ব্যাপক হত্যাকাণ্ড তার সবচেয়ে নির্মম উদাহরণ। কিন্তু গত শতকের শেষ তিন দশকে পৃথিবীব্যাপী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩১টি থেকে বেড়ে ৮১টি হয়েছে।

এসব সংস্কারকের একেকজনের জন্য একেক রকম পরিণতি অপেক্ষা করছিল। হাভেল ও ম্যান্ডেলা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পরও তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন, আবার পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওয়ালেসা একজন খেয়ালি ও অনির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে পরিচিতি পান। কিন্তু তাঁদের কারোরই অং সান সু চির মতো এমন অপ্রত্যাশিত ও ভয়ানক রূপান্তর ঘটেনি। সু চির নৈতিক স্পষ্টতা ও ক্ষমাপূর্ণ সহনশীলতা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার ও অসহিংসতার একজন শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত করেছে (২০১১ সালে তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়)। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে যখন তিনি মিয়ানমারের কার্যত নেতায় পরিণত হন, তখন থেকে তিনি একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নিরাসক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো বর্বর নির্যাতনের ঘটনায় এটা সবচেয়ে গুরুতরভাবে ধরা পড়েছে।

মিয়ানমার ১৩৫টি স্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর একটি জোড়াতালি দেওয়া দেশ। এদের মধ্যে দেশের মধ্যাঞ্চলের বামার জাতিগোষ্ঠী সবচেয়ে প্রভাবশালী। বামাররা মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ। দেশটির ক্ষমতাসীন এলিটদের বেশির ভাগও বামার। অসংখ্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বামার নেতৃত্বাধীন সরকারের দশকের পর দশক ধরে চলা সশস্ত্র সংঘাত ধীরে ধীরে ফুটন্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। সু চির বাবা অং সান একজন বামার জেনারেল ছিলেন। তাঁকে বার্মার আধুনিক জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অং সান ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ধ্বংসের স্বার্থে কয়েকটি গোষ্ঠীকে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে একত্র হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার কিছুকাল

আগেই অং সান নিহত হন। স্বাধীনতার পরপরই নতুন জাতি গোত্রভিত্তিক সংঘাতে নিমজ্জিত হয়।

এসব গৃহযুদ্ধই ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের অজুহাত তৈরি করে দিয়েছিল (সামরিক বাহিনী পরবর্তী সময়ে দেশটির নাম বার্মা থেকে মিয়ানমার করেছিল; পুরোনো রাজধানী ইয়াঙ্গুনের নাম বদলিয়ে রেঙ্গুন করেছিল এবং নেপিডোকে নতুন রাজধানী বানিয়েছিল)। গণতন্ত্রের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখেই জান্তা অদক্ষতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে পঞ্চাশ বছর দেশ শাসন করে। ২০১৫ সালে যখন বহুদিন পর উন্মুক্ত নির্বাচন দেওয়া হলো, সু চির জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এনএলডি ও সেনাবাহিনী সচেতনভাবে একটি সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে ২০১৬ সালে এমন একটি সরকার গঠিত হয়, যা বেসামরিক নেতৃত্বাধীন হলেও এতে সামরিক বাহিনীর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থেকে যায়।

ক্ষমতায় গিয়ে সু চি তাঁর বাবার মতো আলোচনার মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমাদের দেশ শান্তির জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।' কিন্তু কিছু সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং সেনাবাহিনী শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে। সরকারের সমালোচনামুখর সাংবাদিক ও আন্দোলনকর্মীদের জেলে ঢোকানো হয়। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা হলো রোহিঙ্গাদের দুর্দশা একটি মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়। গত বছরের অক্টোবর ও চলতি বছরের আগস্টে সেনাবাহিনী ও পুলিশের চৌকিতে রোহিঙ্গা উগ্রবাদীদের হামলার রেশ ধরে হিংস্র নির্যাতন শুরু হয়। গত মাস পর্যন্ত চার লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে নির্বিচার হত্যা ও গণধর্ষণের আলামত। ভূ-উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায়, দুই শয়ের বেশি রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে।

মিয়ানমারের ভেতরে অন্য প্রায় সব নৃগোষ্ঠীর মানুষই রোহিঙ্গাদের ঘৃণা করে। দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ। বেশির ভাগই মুসলিম রোহিঙ্গাদের অবৈধ অভিবাসী মনে করে। মিয়ানমার সরকারের নৃগোষ্ঠীর তালিকায় রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধে সু চি কোনো ব্যবস্থাই নেননি। জাতিসংঘের একটি মানবাধিকার দল এই সংকটের অনুসন্ধানে আসতে চাইলে সু চির সরকার ভিসা দিতে অস্বীকার করে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকেও সাহায্য দিতে বাধা দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার এই সামরিক অভিযানকে 'জাতিগত নিধনের পাঠ্যবই উদাহরণ' বলে আখ্যায়িত করেছে। সু চির মতো

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া ডেসমন্ড টুটু ও মালালা ইউসুফজাই সহিংসতার নিন্দা জানাতে তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের 'সন্ত্রাসী' বলে বর্ণনা করেন এবং বিশ্বব্যাপী চলমান নিন্দাকে খারিজ করে দেন। সু চি বলেন, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'ভুল তথ্যের এক বিরাট তুষারস্তূপ তৈরি করেছে'। তাঁর কার্যালয় থেকে অভিযোগ করা হয়, রোহিঙ্গারা একটা শোরগোল তোলার জন্য নিজেদের ঘরবাড়িতে নিজেরাই আগুন দিয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সু চি এক ভাষণে সেনাবাহিনীর সমালোচনা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং নৈতিক তুলনার একটি স্থায়ী অনুশীলন প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ দুটোই আছে। আমাদের সবকিছুই শুনতে হবে।'

সম্প্রতি আমি মিয়ানমারে গিয়েছিলাম। সমস্যা কোথায় তা বের করতে কয়েক ডজন মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁদের অনেকেই বলেছেন যে সু চির ক্ষমতা খুবই সীমিত। সেনাবাহিনীর ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্বই নেই। এখনো সরকারের মূল জায়গাগুলো সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। গণতান্ত্রিক সংস্কার উল্টে দেওয়ার ক্ষমতাও তাদের আছে। অনেকে মনে করেন, সু চি একটি ঘৃণিত ও ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য দেশের ভেতরে নিজের জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি না নেওয়ার রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ কষেছেন। আবার অন্যরা মনে করেন তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতার অভাব রয়েছে। অনেকে মনে করেন তিনি সেনাবাহিনীর স্বৈরাচারী অভিব্যক্তি এবং সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ বামার জাতিগোষ্ঠীর মতো মুসলিমবিরোধী কুসংস্কার ধারণ করেন। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁদের প্রায় সবাই তাঁর রূপান্তরের গতি ও মাত্রা দেখে আশ্চর্যান্বিত। একজন সাবেক ছাত্র আন্দোলন কর্মী ও রাজনৈতিক বন্দী, যিনি সু চির দেহরক্ষী হিসেবেও কাজ করেছেন, তিনি আমাকে বলেন, 'আমরা কখনো ভাবিনি যে অং সান সু চি আমাদের এতদূর নিয়ে আসবেন। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এটাও ভাবিনি যে ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তিনি নিজেকে এতটা বদলে ফেলবেন।'

১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই বার্মার স্বাধীনতায় উত্তীর্ণের লক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে সশস্ত্র ব্যক্তিরা যখন বিস্ফোরণ ঘটাল এবং অং সান সু চির বাবা ও আরও আটজনকে হত্যা করল, তখন সু চির বয়স মাত্র দুই বছর। তাঁর বাবার কিংবদন্তি ছায়ায় বড় হওয়া সু চি স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ডামাডোল থেকে বহুলাংশে রক্ষা পেয়েছিলেন। রেঙ্গুনে মেথডিস্ট ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয়ে সু চি নৈতিকতা ও ভূগোল বিষয়ে পাঠ নেন। সু চির বাল্যবন্ধু ও বার্মার স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম প্রেসিডেন্টের কন্যা সাও হায়মার থাইকে আমাকে বলেন যে সু চি ছিলেন একজন আন্তরিক, কেতাবি মেয়ে যাকে লালন-পালন করেছেন 'খুব দৃঢ়, কোমল

হৃদয়ের মা' খিন চি। ১৯৬০ সালে খিন চি ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন। সু চিকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। তার দুই বছর পর বার্মায় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় আসে।

পনেরো বছর বয়সে সু চি বার্মা ছেড়ে যান। প্রায় আটাশ বছর তিনি মাঝে মাঝে ঘুরে যেতেন, কিন্তু একেবারে ফিরে আসেননি। নয়াদিল্লিতে বিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষার্থী ছিলেন। তারপরে তিনি অল্প সময়ের জন্য নিউইয়র্কে জাতিসংঘে কাজ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মাইকেল এরিসকে বিয়ে করেন। এরিস ছিলেন একজন তরুণ ব্রিটিশ পণ্ডিত। তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। এই দম্পতির দুটি পুত্রসন্তান ছিল। এই পরিবার তখন অক্সফোর্ডে স্থায়ী হয়। সেখানে সু চি গৃহস্থালির কাজকর্ম নিয়েই থাকতেন। বাজারসদাই করার পাশাপাশি ছেলেদের কাপড়ে সুতা দিয়ে নাম লিখে দিতেন। কিন্তু বাবার উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অদৃষ্টের উপলব্ধি প্রবেশ করে দেয়। তাঁর বাবার জীবনের ওপর গবেষণা করে একটি জীবনী লেখেন, যেখানে বাবার অর্জনগুলো উল্লেখ করেন। এরিসকে বিয়ে করার আগে তিনি একটি চিঠি লেখেন। সেখানে স্পষ্ট করে বলেন যে তাঁর দেশই তাঁর কাছে আগে। তিনি লেখেন, 'আমি শুধু একটা জিনিস চাইব যে যদি আমাকে আমার জনগণের দরকার হয় তাহলে তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তুমি কি খুব বেশি কিছু মনে করবে যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়? এর কতটুকু সম্ভাবনা আছে আমি জানি না, কিন্তু সম্ভাবনা আছে।'

১৯৮৮ সালে সেই সম্ভাবনা হাজির হলো। মার্চ মাসে সু চির মা স্ট্রোক করেন। তখন তিনি তাড়াহুড়ো করে বার্মায় আসেন। সামরিক শাসনের সময়ে ব্যাপক ধ্বংস সাধন ঘটেছে। যে দেশে এককালে শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এবং এশিয়ার মধ্যে অন্যতম উর্বর ধান উৎপন্ন হতো, তা পৃথিবীর অন্যতম গরিব দেশে পরিণত হয়। এর জন্য অর্থনীতিকে জাতীয়করণ করার সামরিক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা দায়ী। সু চি যখন বার্মা এলেন, তখন জান্তার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন জ্বলে উঠেছিল। জনতার ওপর সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করে। এক মাসের মধ্যে শত শত মানুষ নিহত হয়। সেনা কর্মকর্তা, আইনজীবী, ছাত্র ও লেখকদের একটি দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি নামক একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা হতে সু চিকে আমন্ত্রণ জানায়।

সু চি প্রায় তিন দশক দেশের বাইরে ছিলেন। তাঁর কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও নেই। কিন্তু এনএলডির প্রতিষ্ঠাতারা চাচ্ছিলেন অং সানের পরিবারের

কোনো সদস্যের মাধ্যমে তাদের মিশনকে শুদ্ধ করতে। সু চিও সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। ২৬ আগস্ট সু চি তাঁর প্রথম ভাষণ দেন বার্মার সবচেয়ে পবিত্র বৌদ্ধ স্থান শেদাগোন প্যাগোডায়। স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তিনি তাঁর বাবার স্মৃতিচারণা করেন এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে 'জাতীয় স্বাধীনতার দ্বিতীয় সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন।

সু চি সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন। ১৯৮৯ সালের মে মাসে জনগণের চাপে জান্তা সরকার পরবর্তী বছরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। কিন্তু শিগগিরই কোনো বিচার ছাড়াই সু চিকে গৃহবন্দী করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'রাষ্ট্রকে বিপন্ন করা'। সেই সঙ্গে এনএলডির বেশির ভাগ নেতাকেই বন্দী করা হয়। তা সত্ত্বেও তারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তবে জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপরের একুশ বছরের পনেরো বছরই সু চি ইয়াঙ্গুনে তাঁর পরিবারের লোকের পাশে অবস্থিত বাড়িতে আবদ্ধ অবস্থায় কাটিয়েছেন। জান্তা তাঁকে দুবার মুক্ত করে আবার বন্দী করে। তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসেবে নিরস্ত করতে গিয়ে জেনারেলরা অসাবধানতাবশত সু চিকে নিজেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত করেছে।

১৯৯৯ সালে সু চি এক নিদারুণ পীড়াদায়ক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন। তাঁর স্বামীর টার্মিনাল ক্যানসার ধরা পড়ে। তিনি স্ত্রীকে দেখার জন্য মিয়ানমারে আসতে জান্তার অনুমতি চান। বারবার অনুরোধ করার পরও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু জেনারেলরা সু চিকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, যাতে তিনি অক্সফোর্ডে তাঁর স্বামীকে দেখতে যেতে পারেন। তিনি ও এরিস দুজনেই জানতেন যে যদি একবার তিনি দেশ ছেড়ে যান, তাঁকে আর দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। সু চি মিয়ানমারে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তাঁর স্বামীকে আর কখনোই দেখতে পাননি।

২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে অং সান সু চিকে চূড়ান্তভাবে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রায় এক বছরের কিছু বেশি সময় পরে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আরেকজন নারী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর নাম হলো ওয়াই ওয়াই নু। তিনিও একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তাঁর বাবা একজন সাবেক প্রধান শিক্ষক, যিনি ১৯৯০ সালের বাতিল হওয়া নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৫ সালে যখন ওয়াই ওয়াই নু আঠারো বছরের আইনের শিক্ষার্থী, তখন তাঁকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মামলা কিসের ছিল সে বিষয়ে বিচারকেরা কোনো নোট নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর বোন, ভাই, মা ও বাবার সঙ্গে নুকে ইয়াঙ্গুনের কুখ্যাত ইনসেইন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। গোসল বা অন্যান্য পানির প্রয়োজনে তাঁকে তিন

কাপ পানি দেওয়া হতো। পরবর্তী সময়ে ভালো ব্যবহারের জন্য তা পাঁচ কাপে উন্নীত করা হয়।

কিন্তু সু চি যেখানে একজন অভিজাত বামার, ওয়াই ওয়াই নু সেখানে একজন রোহিঙ্গা। তিন বছর আগে ইয়াঙ্গুনে নুয়ের প্রতিষ্ঠা করা উইমেন পিস নেটওয়ার্ক আরাকান নামে একটি এনজিওর কার্যালয়ে প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে (রাখাইন রাজ্যের পূর্ব নাম আরাকান। রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল এই আরাকান মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের একটি নিম্নভূমি উপকূলীয় এলাকা)। আমি জীর্ণ পাঁচটি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় দেখলাম সিঁড়ির পাশে দেয়ালে লম্বা দড়ি দিয়ে একটি খালি ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এক মিনিট পর তরকারি রান্নার জন্য ঝুড়িটি পেঁয়াজ, আদা ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এই শহরে এটা একটা উন্নত তাকওয়ালা বাক্স, যে শহরের উষ্ণপ্রধান গলদঘর্ম অবস্থায় সিঁড়ি ভেঙে ওঠাই শাস্তির সমতুল্য।

অফিসে ঢোকার মুখে দেখলাম বিক্ষিপ্ত স্যান্ডেল, কাচখচিত কীলক বা গোঁজ এবং ছেঁড়া খড়ের জুতা। কার্যালয়টি একধরনের নিষ্ঠার শক্তিতে বলীয়ান। সতর্ক টানা লেখায় একজন তরুণী একটি সাদা বোর্ডে প্রচলিত এনজিও ইংরেজির টুকিটাকি জিনিস লিখে রেখেছেন, 'সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'নারীর ক্ষমতায়ন', 'কারিগরি প্রশিক্ষণ'। ওয়াই ওয়াই নু ছিলেন তৃষ্ণার্ত, কিন্তু বুদ্‌বুদপূর্ণ হাসি ও সপ্রাণ চোখে আমাকে বললেন যে তিনি বড় হয়েছেন রাজনীতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে—'ছোট্ট মেয়ে হয়ে বড়দের কথা শুনতে শুনতে'। তাঁর আগের রোল মডেল ছিলেন অং সান সু চি। তিনি বলেন, 'আমার বাবার ডায়েরিতে সু চির ছবি লুকানো থাকত। সেখান থেকে আমাকে সু চির ছবি দেখাত।' নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগেও ভাবা যেত যে মানবাধিকারের জন্য সু চির লড়াইয়ে রোহিঙ্গাদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গারা কল্পনা করেছে, কোনো জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্যাতনের বদলে তাদের জন্য কিছু করবে।

রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির প্রমাণ—সেই অর্থে মুসলিমদের—অনেক শতাব্দী আগের। কিন্তু মিয়ানমারের অন্য গোষ্ঠীগুলো রোহিঙ্গাদের ঔপনিবেশিক সময়ের চিহ্ন হিসেবে দেখে, যখন বার্মাকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ব্রিটিশরা উপনিবেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অ-বৌদ্ধদের কাজ করাতে বার্মায় নিয়ে আসে। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এর পরিবর্তে বেশির ভাগই রোহিঙ্গাদের বাঙালি বলে ডাকে। সাধারণত দেখতে দক্ষিণ এশীয়দের মতো হওয়ায় সহজেই অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও রাখাইনের বৌদ্ধদের বামার এলিটরা

নির্যাতন করার পাশাপাশি প্রান্তিক করে রেখেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আবার রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের সংঘাত চলমান রয়েছে।

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার সময়ে রোহিঙ্গারা বহুলাংশে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো নতুন জাতিতে নিজেদের স্থান খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিল। রোহিঙ্গারা সংসদে ছিল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সামরিক জান্তা একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী, বামার আধিপত্যবাদী পন্থা অবলম্বন করেছে এবং পরবর্তী দশকগুলোয় রোহিঙ্গাদের পদ্ধতিগতভাবে দুশ্চারিত্রিক বানানো হয়েছে। তাদের অনেককেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৮২ সালের নতুন নাগরিকত্ব আইনে তাদের বাঙালি বহিরাগত হিসেবে নতুন করে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। যদিও ওয়াই ওয়াই নুয়ের বাবার মতো রোহিঙ্গা রাজনীতিবিদেরা সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারত, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়। রোহিঙ্গারা ভালো বিদ্যালয়ে পড়তে পারত না। যারা স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে পারত না, দেশের অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার স্বাধীনতা তাদের জন্য সীমিত করে ফেলা হয়। কাজের জন্য মুখিয়ে থাকা ও রাষ্ট্রহীন অবস্থায় থাকা রোহিঙ্গারা দেশের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য পাচারকারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তারা সচরাচর থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্য সমুদ্রোপযোগী নৌকায় চড়ত না। সমুদ্রপথে শয়ে শয়ে রোহিঙ্গা মারা পড়ে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকার লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে বন্দিশিবিরে আটকে রাখে, যেখানে খাদ্য ও চিকিৎসার সুবিধা খুবই কম।

ওয়াই ওয়াই নু অন্য রোহিঙ্গাদের মতো নয়। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্বনাগরিক, পাতলা গড়নের এবং ঘোমটা পরেন না। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময়েও সু চি ও তাঁর দল এনএলডি ক্ষমতায় এলে কী ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। 'রোহিঙ্গা' শব্দ ব্যবহারে সু চির অস্বীকার এবং মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পলায়নপরতাকে নু দেখেও না দেখে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উত্তেজনা নিজের আয়ত্তে নিতে সু চি তাঁর নির্বাচনী কৌশলের জন্য এ রকম অবস্থান নিয়েছেন। ওয়াই ওয়াই নু আমাকে বলেন, 'অবশ্যই আমরা হতাশ। কিন্তু আমি মনে করি সু চিকে সমর্থন করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। একবার গণতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় এলে আমাদের সুযোগ ও আশা দুটোই বাড়বে।'

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি আবারও ওয়াই ওয়াই নুয়ের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু সেটা মিয়ানমারের বাইরে। এখন তিনি মনে করেন যে তাঁর জনগোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করা হবে। তিনি আমাকে বলেন যে দেশ থেকে সমগ্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের একটি পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত। তিনি বার্মার সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে নজর রাখছিলেন। সেখানে যা পড়ছেন সে বিষয়ে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত। বর্মি কর্মকর্তারা বলছিল যে গণধর্ষণ সম্ভব নয়, কারণ রোহিঙ্গা নারীরা খুবই নোংরা। ওয়াই ওয়াই নু বলেন, 'যেহেতু বেসামরিক সরকার এসব কথা বলছে, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি ঘৃণা বাড়ছে। আগে সামরিক স্বৈরশাসকেরা ক্ষমতায় ছিল। তাই তারা ঘৃণাপূর্ণ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু এখন অং সান সু চির বেসামরিক সরকারই এসব মূর্খ কথা বলছে। আর এর ফলে ঘৃণা আরও বেশি বৈধতা পাচ্ছে।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক কেনেথ রথ মনে করেন, অং সান সু চির ব্যাপারে হতাশ হওয়াটা হাস্যকর। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন যে যদিও তাঁর সংগঠন দশকের পর দশক সু চির লক্ষ্যকে সমর্থন করেছে, তবু ২০১২ সালের শুরু থেকেই সু চি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলেন। তিনি বলেন, 'আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে এর মধ্যেই সু চির সমালোচনা করা শুরু করেছি। আমার ধারণা যারা সমালোচনা করে, তাদের সঙ্গ সু চি চান না।' রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধনের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলাটাকে রথ সু চির রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, 'সু চি ভাবছে, এটা করার কোনো দরকার নেই। এই মানুষগুলো এতই জনপ্রিয়তাহীন যে তাদের সুরক্ষার চিন্তা করার কোনো মানেই হয় না।'

মিয়ানমারের উল্লেখযোগ্য অ-রোহিঙ্গা মুসলিম জনসংখ্যার জন্যও অভিযোগের পরিবেশ ক্ষতিকর। এই অ-রোহিঙ্গা মুসলিমদের অনেকেই সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী শ্রেণি। ২০১২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় মিয়ানমারের বাণিজ্যিক শহরগুলোয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামভীতি খুবই গভীরে প্রোথিত। সম্প্রতি উগ্রবাদী ভিক্ষুরা ইসলামভীতির পালে হাওয়া দিয়েছে। তারা মনে করে ইসলাম আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পরবর্তী নিশানা হলো মিয়ানমার। ভিক্ষুরা ব্যাপক সম্মানিত। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বর্মিরাও সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে বলেছে যে কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ জন্মহারও একধরনের জিহাদ।

আমি সু চির একজন দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর নাম ধাম্মা পিয়া। তিনি ইয়াঙ্গুনের একটি মঠের মঠাধ্যক্ষ। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বৌদ্ধ উগ্রবাদীদের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি খুব গর্বের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সময় থেকে সব মুক্তি আন্দোলনে ভিক্ষুদের ভূমিকার কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'তরুণেরা মুসলিমদের ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।' তবে তিনি আরও বলেন, 'অনেক কালার (মুসলিমদের নিন্দাসূচক উপাধি) জানে না কীভাবে ভালো

ব্যবহার করতে হয়। এর কারণ তারা কোনো ভালো শিক্ষা পায়নি। তাই আচরণ কিছুটা হিংস্র হতে পারে।' যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কী ধরনের আচরণের কথা তিনি বলছিলেন, তখন মুসলিমরা যে প্রায়ই ট্রাফিক বন্ধ করে দেয় তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

বৌদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদীরা বার্মার রাজনীতির কেন্দ্রভূমি ক্ষয় করে ফেলছে। ২০১৫ সালের নির্বাচনে এনএলডি উদ্বিগ্ন ছিল কীভাবে 'মুসলিম দল' হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়া যায়। সে জন্য তারা একজনও মুসলিম প্রার্থীকে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম কোনো মুসলিম বর্তমানে সংসদে নেই। সু চির সরকার এমন কোনো চেষ্টাও করেনি যা মুসলিমদের সন্তান গ্রহণের ওপর আরোপিত বাধা রদ করতে পারে এবং মুসলিম পুরুষ ও বৌদ্ধ নারীদের মধ্যে বিয়ে সংঘটনে যে বাধা ছিল তা বাতিল করতে পারে।

ইয়াঙ্গুনে এক বৃষ্টিস্নাত দিনে আমি তিন মিন্ট নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত তেলবিষয়ক প্রকৌশলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মিন্টের বাবা ছিলেন একজন মুসলিম, যিনি অং সানের মন্ত্রিসভায় ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই নিহত হন। সময়টা ছিল রমজানের শুরু। তাই মিন্টের গৃহতত্ত্বাবধায়কের দেওয়া তালের রসের পিঠায় আমি খুব সচেতনভাবে কামড় দিলাম। কিন্তু তিন মিন্টও আমার সঙ্গে চায়ে চুমুক দিল। রোজার কঠোর নিয়ম পালনের চেয়ে অতিথিকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে তিনি চা পান করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের ধর্মকে জাঁকালোভাবে প্রদর্শন করতে পারি না। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পোশাক ও খাবার রয়েছে। আমি সব সময় আমার ধর্মের লোকদের এ কথা বলি।' তিনি রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য কোনো বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। তিনি বলেন, 'ইয়াঙ্গুনের মুসলিমদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সংযোগ খুবই কম।'

কো নি নামে একজন প্রখ্যাত মুসলিম আইনজীবী মিন্টের বন্ধু ছিলেন। জানুয়ারি মাসে তিনি নিহত হন। সে বিষয়েই আমরা কথা বলি। কো নি এনএলডি দলের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। দলের অন্য মুসলিমদের মতোই সু চির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের জন্য দলত্যাগী সাবেক সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের দায়ী করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড ইয়াঙ্গুনকে সন্ত্রস্ত করে ফেলে। তাঁর জানাজায় বিভিন্ন ধর্মের হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। তবে সু চি জানাজায় যাননি। এমনকি তিনি ফুলও পাঠাননি বা কো নির পরিবারকে সান্ত্বনাও জানাননি এবং এক মাস তিনি কোনো মন্তব্য করা থেকেও বিরত থাকেন। কো নির মৃত্যুর পরের কয়েক মাসে আমি কয়েক ডজন বর্মি মুসলিমের কাছে সু চির নীরবতা বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি জানতে চেয়েছি। তাঁরা সবাই সু চির সমালোচনা করতে ইতস্তত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই তিন মিন্টের মতোই বলেছেন, 'অবশ্যই সু চির বিশেষ কারণ রয়েছে।'

২০১৫ সালের নির্বাচনে সু চির দলকে ভোট দেওয়া লাখ লাখ ভোটারের মধ্যে পাণ্ডুবর্ণের, চশমা পরিহিত সাবেক জেনারেল খিন নিন্তও রয়েছেন। তাঁকে মিয়ানমারে সবচেয়ে বেশি ভয় পেত মানুষ। আশির দশকের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। তিনি স্টাসির মতো গুপ্তচর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন এবং হাজার হাজার মানুষের গ্রেপ্তার তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি বলপূর্বক শ্রম প্রকল্পেরও দায়িত্বে ছিলেন, যেখানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী এলাকা থেকে মানুষ ধরে এনে সেনাবাহিনীর অবকাঠামো প্রকল্পে কাজ করানো হতো, যাদের বেশির ভাগই ছিল শিশু। ২০০৩ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সংস্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি নৃতাত্ত্বিক মিলিশিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিও সম্পন্ন করেন। দীর্ঘদিনের জান্তাপ্রধান থান শোয়ে সু চিকে এতটাই অপছন্দ করতেন যে তাঁর উপস্থিতিতে তিনি সু চির নাম উল্লেখ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু খিন নিন্ত সু চির সঙ্গে সংলাপ আয়োজন করেন।

মাত্র এক বছর পরেই শাসকদের বিরোধী উপদল তাঁকে উৎখাত করে এবং তিনি সাত বছরের বেশি সময় গৃহবন্দী অবস্থায় কাটান। তাঁকে যে বাসায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এই বাসার মেঝেতে তিনি একটি আর্ট গ্যালারি ও হস্তশিল্পের দোকান চালান। সেখানে পর্যটন স্থানের জাঁকালো ছবি, সংরক্ষিত বনের অংশ ও কম দামি জেড পাথরের ব্রেসলেট বিক্রি করা হয়। খদ্দেরের অভাবে একটি কফির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাট্টার ছলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি আমাকে বলেন, 'মানুষ এখানে আসতে ভয় পায়। আমি জানি না কেন।' আমার অনুবাদক (এক বন্ধু যিনি জর্জ অরওয়েলের কাজ বর্মি ভাষায় অনুবাদ করছেন) বুঝতে পেরেছিলেন কেন মানুষ ভয় পায়: রাখাইন রাজ্যে শৈশবে তিনি খিন নিন্তের সড়ক কর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে খিন নিন্তের এত কাছে বসায় তিনি ভেতরে-ভেতরে ভয়ে কাঁপছিলেন।

নাদুসনুদুস মুষ্টিতে আমার হাত ধরে খিন নিন্ত বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম এনএলডির "পরিবর্তনের সময়" স্লোগান খুব ভালো ছিল। দাও অং সান সু চি শৃঙ্খলার গুরুত্ব বোঝেন, তাই এই দেশের ব্যাপারে আমার অনেক প্রত্যাশা।'

সু চির ক্ষমতায় আসাকে তিনি একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'আগে সু চি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাই ব্যাপারটা সামরিক শাসনের মতো ছিল না। কিন্তু এখন তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মিন অং লাইংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছেন। মনে হচ্ছে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁকে দর-কষাকষি করতে হবে।'

নিন্ত ঠিকই বলেছেন। যাদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন তাদের সঙ্গে কাজ করা ছাড়া সু চির আর কোনো বিকল্প নেই। সু চির ক্ষমতায় আসীন হওয়ার রমরমা অবস্থার ফলে সেনাবাহিনীর হাতেও যে বিপুল ক্ষমতা রয়েছে, তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সীমান্তবিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলো সেনাবাহিনীর হাতে। এ ছাড়া সংসদের এক-চতুর্থাংশ আসনও তাদের জন্য সংরক্ষিত। এমনকি যেসব মন্ত্রণালয় বেসামরিক হাতে, যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়, সেগুলোও সামরিক শাসনের সময়কার ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে। দেশের বাজেটের বহুলাংশ সামরিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। ২০০৮ সালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক লিখিত মিয়ানমারের সংবিধানও সমস্যা তৈরি করছে। সেখানে সেনাবাহিনীর জরুরি অবস্থা ডাকা ও ক্ষমতা দখল করার বিধান রয়েছে। সেখানে এমন আরেকটি ধারা রয়েছে যা সু চিকে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে অযোগ্য করে রেখেছে (বর্তমানে কাজ চালানোর জন্য তাঁকে স্টেট কাউন্সেলর করে রাখা হয়েছে)। সু চি সংবিধান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট হতে চান, কিন্তু সে জন্য সেনাবাহিনীর সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানে তাঁকে যে দুর্বল অবস্থান দেওয়া হয়েছে, সেটাই সেনাবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু না বলার জন্য দায়ী বলে মনে করে তাঁর পক্ষের লোকজন। সেনাবাহিনীকে সাংবিধানিক সংস্কারে চাপ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে অবশ্যই বিরুদ্ধাচরণ ও সামরিক শাসনে ফেরত আসা এড়িয়ে চলতে হবে।

কিন্তু সেনাবাহিনীকে তিরস্কার করতে তাঁর ব্যর্থতা শুধু বাস্তবতাবাদিতার কারণে নয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর একজন সাবেক কমান্ডার-ইন-চিফ। সু চির বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাও সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য। এনএলডির পরিচালনার ক্ষেত্রেও সামরিক বাহিনীর প্রতি আনুগত্য এবং এর শ্রেণিবিভাজনের ওপর জোর দেওয়া হয়। দলের নেতা তো দূরের কথা, বহিষ্কার হওয়ার ভয়ে কোনো সদস্যই জনসমক্ষে সামরিক বাহিনীর সমালোচনা করতে ভয় পায়। একজন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য গর্বের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' বশ্যতা স্বীকারের সংস্কৃতির মানে হলে সব সময় স্টেট কাউন্সেলরের দরজায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে।

যদিও এনএলডি তরুণ মেধাবীদের দলে টেনেছে, কিন্তু দলের নেতারা তাদের বয়স এবং কারাবন্দিত্বের জন্য বিখ্যাত। সু চির বাল্যবন্ধু সাও হায়মার থাইকে আমাকে বলেন, 'সু চির আশপাশে সব উচ্চপদস্থ থাকে, তৃণমূল থেকে কেউ নেই। তাঁর খুব বেশি ভালো উপদেষ্টাও নেই। তাঁর রয়েছে শুধু নিজের ভাবনা। অন্যরা তাঁকে তথ্য দিতেও ভয় পায়।'

জান্তার বিরুদ্ধে শত বিরোধিতার পরও সু চি একজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের সন্তানই রয়ে গেছেন। বর্তমানের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বর্মি স্বাধীনতা সেনাদের উত্তরাধিকার। আর সু চির বাবা ১৯৪১ সালে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। শোয়েদাগন প্যাগোডায় দেওয়া বক্তব্যে সু চি এই ইতিহাস শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আমি অসংকোচে বলতে পারি যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ রয়েছে। শুধু যে এই বাহিনী আমার বাবা গঠন করেছিলেন তা-ই নয়, ছোট শিশু হিসেবে আমি সেনাদের কাছ থেকে স্নেহ পেয়েছি।' তিনি সামরিক বাহিনীর অনেক মূল্যবোধ ধারণ করেন। তাই বারবার তিনি শৃঙ্খলা ও একতার ওপর জোর দেন। সংসদে একটি আসন জয়ের এক বছর পরে ২০১৩ সালে তিনি পর্যবেক্ষকদের অবাক করে দিয়ে জেনারেলদের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সামরিক প্যারেডে অংশ নেন।

২০০৩ সালে প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী হিসেবে জডি উইলিয়ামসকে সু চির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় (উইলিয়ামস ১৯৯৭ সালে ভূমিমাইন নিষিদ্ধকরণে পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্রচারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পান)। আমি উইলিয়ামসের সঙ্গে কথা বলেছি। উইলিয়ামস লক্ষ করেছেন যে জেনারেলরা সু চির স্বাধীনতা খর্ব করলেও তাদের প্রতি সু চি একটা বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। উইলিয়ামস আমাকে বলেন, 'সু চি বলেছেন যে "যদি সামরিক বাহিনী বিশাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মালিক হয়, তাহলেও আমার কোনো সমস্যা নেই।" এটা কোনো ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি নয়, কিন্তু শুনতে আশ্চর্য মনে হয়।' যা বলা হয়নি সে বিষয়ে উইলিয়ামস আরও বেশি হতভম্ব হয়েছিলেন, 'যে বিষয়টা সু চিকে বৈশ্বিক আইকনে পরিণত করেছে, সেই মানবাধিকার বিষয়ে তিনি একেবারেই কিছু বলছেন না।'

সু চি যখন ২০১২ সালে নিউইয়র্কে একটি এনজিওর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন উইলিয়ামসের সন্দেহ আরও গাঢ় হয়। উইলিয়ামস সে এনজিওর একজন সহপ্রতিষ্ঠাতা। সু চি বৈঠক তছনছ করে দিয়ে চলে যাওয়ার পরে একজন তরুণ বর্মি কর্মী কত আতঙ্কিত হয়েছিল তা স্মরণ করে উইলিয়ামস আমাকে বলেন, 'সু চি তাঁর দেশের মানবাধিকার বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের ব্যাপারে বিরূপ ছিলেন। সেই কর্মী তার নায়িকাকে দেখে খুবই উদ্দীপিত হয়েছিল। যখন সু চি এমন প্রতিকূল আচরণ করল, বেচারী তরুণ নারী কর্মীটি তখন একটানা বলতে থাকে, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তিনিই অং সান সু চি?"'

উইলিয়ামস ভেবেচিন্তে দেখেছেন যে সু চিকে মানবাধিকারের সেক্যুলার সাধু হিসেবে আগে যেভাবে ভক্তি করা হতো এবং এখন যেভাবে তাঁর রূপান্তরে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে, দুটোই ভুল ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, 'অন্যরা সু চিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সু চি তা করতে দিয়েছেন।' উইলিয়ামস সন্দেহ পোষণ করেন যে ১৯৮৮ সাল থেকে সু চির লক্ষ্য একই রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে, যখন তিনি তাঁর নিজভূমে ফিরে এলেন, তাঁর বাবার আচ্ছাদন ধারণ করলেন, নেতৃত্বের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং বিজয় থেকে বঞ্চিত হলেন। উইলিয়ামস বলেন, 'যখন তিনি ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তারপরে তারা নির্বাচনে জয়ী হলেও তাঁর কাছ থেকে সেই জয় ছিনিয়ে নেওয়া হলো, তখন থেকেই তাঁর মন লেজারের বিমের মতো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল। ক্ষমতায় যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র প্রয়াস, বাকি সব গোল্লায় যাক।'

আমি একবার অং সান সু চিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মানুষের মধ্যে কোন গুণটিকে তিনি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আনুগত্য।' অনেকেই এর সত্যতা নিশ্চিত করেছে। নেপিডোতে আমি এনএলডি সাংসদ কোয়ায় শোয়ের সঙ্গে দেখা করি। ২০০৩ সালে একবার যখন সু চি মুক্তি পেলেন, তখন শোয়ে তাঁর গাড়িচালক হিসেবে দেশ সফরের সঙ্গী ছিলেন। ৩০ মে সশস্ত্র ঘাতকেরা তাঁর বহরে হামলা চালায়। এই হামলাকে মনে করা হয়েছিল সামরিক বাহিনীর কঠোর কোনো অংশের নির্দেশে সু চিকে হত্যা করার একটা প্রচেষ্টা। প্রায় সত্তরজন মানুষ নিহত হয় এবং উড়ে আসা কাচে সু চির ঘাড় কেটে যায়। অসহিংসতার নীতিতে অটল থেকে তিনি তাঁর রক্ষীদের পাল্টা আক্রমণ না করার নির্দেশ দেন। কোয়ায় শোয়ে লিন যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে বেশ কটি পথরোধক অতিক্রম করে যান, কিন্তু তারপর আটকে যান।

এ ঘটনার পরে সু চিকে গৃহবন্দী করা হয়। কোয়ায় শোয়ে লিন এবং আরও সতেরোজনকে হাতকড়া অবস্থায় চোখ বেঁধে ভারতীয় সীমান্তের কাছে দূরবর্তী একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে লাথি-ঘুষি মারা হয় এবং সিগারেট ও মোমবাতি দিয়ে তাঁর গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি তাঁর হাতের অগ্রভাগে দাগ দেখেছি। এসব নির্যাতন করার উদ্দেশ্য ছিল এটা স্বীকার করানো যে সহিংসতার জন্য এনএলডিই দায়ী। তিনি বলেন, 'নির্যাতনের মুখে অন্যরা চিৎকার করছিল। আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি নীরব ছিলাম।' তাঁকে এমনই জলাবদ্ধ ছোট একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল যে তিনি শুতেও পারতেন না।

সু চি গৃহবন্দী দশা থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়ার পর কোয়ায় শোয়ে লিন তাঁকে দেখতে যান। সু চি একটি ছোট প্লাস্টিকের লেফাফা হাতে ধরে ছিলেন। বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের দিন শোয়ে লিন যে জলখাবার সু চিকে দিয়েছিল, সেই প্যাকেটের অংশই ছিল এই প্লাস্টিকের প্যাকেট। শোয়ে লিন বলেন, 'তিনি আমাকে বললেন যে তিনি এই জলখাবারের ব্যাগটা রেখে দিয়েছিলেন আমাকে মনে রাখার জন্য। প্রত্যেক দিন তিনি অল্প অল্প খেতেন এবং সরিয়ে রাখতেন।' সবশেষে এই ব্যাগে আর কিছুই বাকি ছিল না, কিন্তু তিনি এটা আট বছর ধরে রেখে দিয়েছিলেন।

সু চি সারা জীবন তাঁর এমন এক পিতার স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন, যাঁকে তিনি ভালো করে চিনতেনই না এবং এমন এক দেশের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থেকেছেন যাকে পনেরো বছর বয়স থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মধ্যে তিনি খুব কমই দেখেছেন। যে একগুঁয়েমি ও নিশ্চয়তার জন্য তাঁকে এখন স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে স্মরণ করা হতে পারে, সেই গুণগুলোই বন্দিদশায় তাঁর উপকারে এসেছিল। বাড়িতে একাকী কাটানো বছরগুলোয় সক্রিয় রাজনীতি থেকে তাঁর দূরত্বের কারণে দেশবাসী তাঁকে নিখুঁত আশার তরি ও বিস্তৃত পৃথিবীর আদর্শবাদী প্রক্ষেপণে পরিণত করেছিল।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কেনেথ রথ আমাকে বলেন, 'পুরোটা না বলেই অং সান সু চি আইকন হওয়ার সুবিধা পেয়েছেন। হাভেল এ জায়গায় এসেছিল নৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে অনেক কিছু বলার পরে। অং সান সু চি তেমন কিছুই বলেননি। তিনি ছিলেন একজন নৈতিক প্রতীক। আর আমরা সে প্রতীকে কিছু নির্দিষ্ট গুণাগুণ খুঁজেছি। তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে বলা শুরু করলেন, তখন সেই গুণাগুণ ভুল প্রমাণিত হলো।' সু চি হাভেলের মতো বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, ম্যান্ডেলার মতো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না অথবা ওয়ালেসার মতো সাংগঠনিক ছিলেন না। তাঁর বাবার মতো তিনি কিংবদন্তি রূপ কালিমালিপ্ত হওয়ার আগে মারাও যাননি।

২০১০ সালের নভেম্বরে সু চির মুক্তির পর তাঁর ছোট ছেলে প্রথমবারের মতো মিয়ানমার সফর করে। তাঁর ছেলে তাঁকে এক দশকে একবারও দেখেনি। ছেলে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার আগে ইয়াঙ্গুনে একটি পোষা প্রাণীর দোকানে গিয়ে তার মায়ের জন্য বাদামি ও সাদা রঙের একটি কুকুরছানা কিনে এনে দেয়। সু চি এই কুকুরছানার প্রতি খুবই মনোযোগী। বিদেশি বিশিষ্টজনেরা দেখেছেন যে এই কুকুরছানার জন্য উপহার নিয়ে আসা মানে হলো বৈঠক ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন থেকেই এই কুকুরছানা একটি আগ্রাসী জন্তুতে পরিণত হয়েছে। যে কেউ তার মালিকের কাছে

ঘেঁষলেই সে গর্জন করে ওঠে এবং হঠাৎ খট করে কামড়ে দিতে চায়। সু চি কুকুরের এসব গ্রাহ্য করেন না। তিনি কুকুরছানাকে সাজাতে পছন্দ করেন। বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময়েও তিনি এই কুকুরছানাকে চুমু খেতে পছন্দ করেন। সু চির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে বলেছে, 'আমি এই কুকুরটাকে ঘৃণা করি। কিন্তু সু চি কুকুরছানাটিকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে, কারণ এই কুকুর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত।'

প্রতি আন্তর্জাতিক চিন্তা

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সত্তা ও সংকটের সময়ক্রম : ১৭৮৪ থেকে ২০১৭

ব্যাপক নির্যাতনের মুখে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পালিয়ে আসা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বছরের পর বছর ধরে তাদের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আরাকান (বর্তমানে রাখাইন প্রদেশ) মিয়ানমারের (সাবেক বার্মা) একটি প্রদেশ। বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূলবর্তী এই এক ফালা ভূমি চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী নাফ নদী থেকে কেপ নেগ্রাইস পর্যন্ত বিস্তৃত। আরাকানের ইউমা রেঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী এই রাখাইন প্রদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ইউমা রেঞ্জ এই প্রদেশকে মিয়ানমারের বাকি অংশ থেকে পৃথক করেছে। আরাকানের মোট আয়তন ১৩ হাজার ৫৪০ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এই প্রদেশেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিচয়কে ঘিরে রাজনীতি ও সহিংসতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আবর্তিত হচ্ছে।

অষ্টম শতাব্দী

রোহিঙ্গা নামে দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনগোষ্ঠী বর্তমানে মিয়ানমারের (সাবেক বার্মা) রাখাইন প্রদেশ নামে পরিচিত স্বাধীন আরাকান রাজ্যে বসবাস করা শুরু করে।

নবম থেকে চৌদ্দ শ শতাব্দী

জনশ্রুতি অনুযায়ী, আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা ইসলামের সংস্পর্শে আসে। আরাকান ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

১০৫৭

রাজা আনাওরাহতা পাগানে প্রথম একক বার্মিজ রাষ্ট্র স্থাপন করেন এবং থেরাভাদা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

১৭৮৪

বর্মি রাজা বোদাওপায়া আরাকান দখল করেন এবং শরণার্থীরা বাংলায় পালিয়ে আসে।

১৭৯০

ব্রিটিশ বাণিজ্যস্বার্থ নিশ্চিত করতে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে দূত হিসেবে রেঙ্গুনে বর্মি রাজার দরবারে পাঠানো হয়। বলা হয়ে থাকে, যে এলাকা পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ হয়েছে সেখানে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কক্সই আরাকান শরণার্থী ও স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তিনিই কক্সবাজার শহরের গোড়াপত্তন করেন, যেখানে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন গোষ্ঠীগুলো বর্তমানে বসবাস করে।

১৮২৪-২৬

ইয়ান্দাবো চুক্তির মাধ্যমে প্রথম অ্যাংলো-বর্মি যুদ্ধের অবসান ঘটে। সে অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও কেপ নেগ্রাইসের মধ্যবর্তী আরাকানের উপকূলীয় এলাকাকে বর্মি ব্রিটিশ ভারতের কাছে সমর্পণ করে।

১৮৫২

দ্বিতীয় অ্যাংলো-বর্মি যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশরা রেঙ্গুনসহ বার্মার নিম্নাঞ্চল স্বরাজভুক্ত করে।

১৮৮৫-৮৬

তৃতীয় অ্যাংলো-বর্মি যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা মান্দালয়া দখল করে নেয়। এর ফলে বার্মা ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

১৯১১

১৯১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, রোহিঙ্গারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত একটি নৃগোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯২১

১৯২১ সালের আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের আরাকানীয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

১৯৩৭

ব্রিটেন বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করে এবং রাজ উপনিবেশে রূপান্তর করে।

১৯৪২

জাপানি প্রশিক্ষিত বার্মা স্বাধীনতা সেনাদের (বিআইএ) সহায়তায় জাপান বার্মা দখল করে। যখন ব্রিটিশরা পিছু হটে, তখন বর্মি জাতীয়তাবাদীরা মুসলিমদের আক্রমণ করা শুরু করে। মুসলিমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সুবিধা পেয়েছে বলে তারা অভিযোগ করে। পরবর্তী সময়ে বিআইএ ফ্যাসিস্টবিরোধী গণমুক্তি সংঘে (এএফপিএফএল) রূপান্তরিত হয় এবং জাপানি শাসন প্রতিরোধ করে।

১৯৪৫

অং সানের (অং সান সু চির বাবা) নেতৃত্বে বর্মি জাতীয়তাবাদী এবং রোহিঙ্গা যোদ্ধাদের সহায়তায় ব্রিটেন বার্মাকে জাপানের কাছ থেকে মুক্ত করে। ব্রিটিশরা আরাকানের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বলে রোহিঙ্গারা আবার প্রতারিত হয়েছে বলে মনে করে।

১৯৪৭

ইউ শ ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর নেতৃত্বে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অং সান এবং তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছয়জন সদস্যকে হত্যা করে। জাপানি দখলদারির সময়ে শাসন করা 'বা মাও'য়ের সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ নুকে এএফপিএফএল এবং সরকারপ্রধান হতে বলা হয়।

১৯৪৮

ইউ নুয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে বার্মা স্বাধীন হয়। প্রথম বছরেই রিপাবলিক অব দ্য ইউনিয়ন অব বার্মা ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। পূর্ব দিকে, নৃতাত্ত্বিক কারেন সামরিক ইউনিটগুলো বিদ্রোহ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। উত্তর দিকে শিগগিরই হতে যাওয়া লাল চীনের সীমান্তে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের উত্থান ঘটে। অবশেষে বর্মি সামরিক বাহিনী বিদ্রোহ দমনে সফল হয়। তবে দেশের প্রান্তিক পার্বত্য অঞ্চলে জাতিগত দ্বন্দ্ব টিকে যায়, যা দেশের পরবর্তী ক্রমবিকাশে গভীর প্রভাব রাখে।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে উত্তেজনা বজায় আছে, যাদের অনেকেই চেয়েছিল আরাকান মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হোক। রোহিঙ্গা সরকারি কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার মাধ্যমে সরকার এর প্রতিশোধ নেয়।

১৯৫০

মুজাহিদ নামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতৃত্বে কিছু রোহিঙ্গা সরকারকে প্রতিরোধ করে। ক্রমেই বিদ্রোহ অবদমিত হয়ে পড়ে।

১৯৫৮-৬০

ক্ষমতাসীন এএফপিএফএল দলের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হলে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নো উইনের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে।

১৯৬০

নির্বাচনে ইউ নুয়ের দলীয় একটি অংশ চূড়ান্ত বিজয়ী হয়। কিন্তু নু বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে উন্নীত করায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সহ্য করায় সেনাবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

১৯৬২

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনী, বা 'তাতমাদাও', অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। তাদের যুক্তি ছিল, বার্মার বিবদমান রাজনীতিবিদেরা দেশকে একতাবদ্ধ রাখতে অক্ষম। এর মধ্য দিয়ে বার্মায় অর্ধশতকেরও বেশি সময়ের সামরিক শাসনের সূচনা হয়। জেনারেল নো উইনের নেতৃত্বে ঘটা সামরিক অভ্যুত্থানে ইউ নুয়ের উপদল বিতাড়িত হয়। নো উইন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এবং 'সমাজতন্ত্রের বর্মি পন্থা' চালু করেন। তিনি অর্থনীতিকে জাতীয়করণ করেন, একদলীয় রাষ্ট্র প্রবর্তন করেন এবং স্বাধীন পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেন। সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে।

১৯৭৪

নতুন সংবিধান প্রণীত হয়, যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে নো উইন ও অন্যান্য সাবেক সামরিক নেতার নেতৃত্বে একটি গণপরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ-এ একজন লেখক বলেছেন যে 'সমাজতন্ত্রের বর্মি পন্থা' এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো—নৃতাত্ত্বিক উগ্র জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা—ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের প্রতিক্রিয়া। কারণ সে সময়ে নিম্নভূমির বর্মি সংখ্যাগুরুদের বদলে অভিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব উ থান্টের দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বার্মায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। বার্মার সামরিক বাহিনী তাঁকে রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

দিতে অস্বীকৃতি জানালে রেঙ্গুন আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির (আরএএসইউ) ছাত্র কর্মীরা সরকারি শোভাযাত্রা থেকে তাঁর দেহ ছিনিয়ে নেয়। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় তছনছ করে দেহ হস্তগত করে। এই কঠোর অভিযানের ফলে শহরব্যাপী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে সরকার মার্শাল ল জারি করে।

১৯৭৫

আঞ্চলিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো বিরোধী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করে। তারা গেরিলা বিদ্রোহ বাড়াতে থাকে।

১৯৭৭

জান্তা অপারেশন নাগামিন বা ড্রাগন কিং শুরু করে। তাদের দাবি ছিল, বিদেশিদের জন্য জনসংখ্যা আড়ালে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অপারেশন চালানো হয়েছিল। সেনাবাহিনীর নির্যাতনের অভিযোগে দুই লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সেনাবাহিনী সব ধরনের অন্যায় আচরণ অস্বীকার করে।

১৯৭৮

রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে বার্মার সঙ্গে একটি চুক্তি করে, যার অধীনে বেশির ভাগ রোহিঙ্গা ফেরত আসে।

১৯৮১

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল সান ইউয়ের কাছে নো উইন রাষ্ট্রপতিত্ব ছেড়ে দেন, কিন্তু ক্ষমতাসীন সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৮২

মিয়ানমারের জাতীয়তা আইন তিন ধরনের নাগরিকত্ব শ্রেণিবিভক্ত করে : নাগরিক, সহযোগী নাগরিক এবং ন্যাচারালাইজড বা অঙ্গীভূত করা হয়েছে এমন নাগরিক। ১৯৪৭ সালের সংবিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী, নাগরিক তারাই যারা 'আদি জাতি'-এর অন্তর্ভুক্ত অথবা ১৯৪২ সালের আগে ব্রিটিশ বার্মায় বসবাস করেছে। অ-নাগরিকদের ফরেন রেজিস্ট্রেশন কার্ড (এফআরসি) দেওয়া হয়। যেসব নাগরিকের পিতামাতা এফআরসিপ্রাপ্ত, তারা সরকারি কাজের জন্য অনুমতি পাবে না। এই আইন রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের ১৩৫টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর একটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে মিয়ানমারের বেশির ভাগ নাগরিকত্ব সুবিধা থেকেই তারা বঞ্চিত।

১৯৮৮

মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফলে অনেক মানুষের সঞ্চয় বিনষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারবিরোধী দাঙ্গা শুরু হয় এবং এতে সহস্র মানুষ নিহত হয়। জেনারেল শ মং শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার কাউন্সিল (এসএলওআরসি) গঠন করেন।

১৯৮৯

এসএলওআরসি মার্শাল ল জারি করে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সমর্থকসহ হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করে এবং বার্মার নামকরণ করে 'মিয়ানমার' আর রেঙ্গুনের নামকরণ করে ইয়াঙ্গুন। অং সানের কন্যা ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) নেত্রী অং সান সু চিকে গৃহবন্দী করা হয়।

১৯৯০

সাধারণ নির্বাচনে এনএলডি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে, কিন্তু সামরিক বাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৯১

শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য সু চিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে যায়। রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে তারা জোরপূর্বক কাজ, ধর্ষণ ও ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করে।

১৯৯২

এসএলওআরসির চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে জেনারেল শ মুংয়ের স্থলে জেনারেল থান শয়ে অভিষিক্ত হন। মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষার্থে কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৯৫

ছয় বছর পরে সু চিকে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৯৬

মুক্তির পর সু চি প্রথম এনএলডি কংগ্রেসে যোগদান করেন; দলীয় কংগ্রেসে যাওয়ার পথে ২০০ জনের বেশি এনএলডি প্রতিনিধিকে এসএলওআরসি গ্রেপ্তার করে।

১৯৯২-৯৭

আরও একটি প্রত্যাবাসন চুক্তির আওতায় প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা বর্তমানে রাখাইন নামে পরিচিত আরাকানে ফিরে আসে।

১৯৯৭

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলোর সংগঠন আসিয়ানে মিয়ানমারকে যুক্ত করা হয়। এসএলওআরসির নাম বদল করে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন কাউন্সিল (এসপিডিসি) রাখা হয়।

১৯৯৮

এনএলডি সদস্যদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, সংসদ আহ্বানের জন্য এনএলডি যে সময়সীমা দিয়েছিল তা পালন করতে ক্ষমতাসীন কাউন্সিল অস্বীকৃতি জানায়, ছাত্র আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করা হয়।

১৯৯৯

সু চির স্বামী মাইকেল এরিস ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাজ্যে মারা যান। তাঁকে দেখতে যাওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন কাউন্সিল সু চিকে যেসব শর্ত দেয় তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

সেপ্টেম্বর ২০০০

ক্ষমতাসীন কাউন্সিল সু চি ও জ্যেষ্ঠ এনএলডি সদস্যদের চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সু চি ক্ষমতাসীন কাউন্সিলের সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করেন।

২০০১

ক্ষমতাসীন কাউন্সিল প্রায় ২০০ জন গণতন্ত্রপন্থী কর্মীকে মুক্তি দেয়। সরকার দাবি করে যে এই মুক্তি গৃহবন্দী থাকা বিরোধীদলীয় নেত্রী অং সান সু চির সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতির প্রতিফলন।

ফেব্রুয়ারি ২০০১

থাইল্যান্ডের সীমান্তে বর্মি সেনাবাহিনীর সঙ্গে শান বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ হয়।

জুন ২০০১

তখন থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা মিয়ানমারে আসেন এবং বলেন যে সম্পর্ক সঠিক পথে ফিরে এসেছে।

মে ২০০২

প্রায় ২০ মাস গৃহবন্দী থাকার পর সু চিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আগস্ট ২০০৩

খিন নিন্ট প্রধানমন্ত্রী হন। গণতন্ত্রের 'রোডম্যাপ' হিসেবে নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনি ২০০৪ সালে একটি সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব করেন।

নভেম্বর ২০০৩

জাতিসংঘের মানবাধিকার দূত মিয়ানমার ভ্রমণ করার পরে পাঁচজন জ্যেষ্ঠ এনএলডি নেতাকে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জান্তার 'রোডম্যাপ টু ডিসিপ্লিন-ফ্লারিশিং ডেমোক্রেসি' এবং প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের চেষ্টা কোনো আত্মসমর্পণ ছিল না, বরং তা ছিল ২০০৮ সালের সংবিধানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে যাওয়া। এর ফলে 'তাতমাদাও' সংসদে এক-চতুর্থাংশ আসন নিশ্চিত করে এবং ৭৫ শতাংশ ভোট প্রয়োজন এমন যেকোনো সংশোধনীর বিরুদ্ধে কার্যত ভেটোও আরোপিত হয়। এর ফলে সু চি একজন বিদেশিকে বিয়ে করায় দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

জানুয়ারি ২০০৪

সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কারেন বিদ্রোহী এবং সরকার দ্বন্দ্ব নিরসনে একমত হয়।

মে ২০০৪

এনএলডির নেত্রী সু চি গৃহবন্দী থাকায় তারা সাংবিধানিক সম্মেলন বর্জন করে। কিন্তু তবুও সম্মেলন শুরু হয়। জুলাইয়ে সম্মেলন মুলতবি হয়।

অক্টোবর ২০০৪

ক্ষমতার লড়াই চলছিল এমন খবরের মধ্যেই খিন নিন্ট প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদচ্যুত হন। তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়।

নভেম্বর ২০০৪

হাজারো বন্দীর মুক্তির অংশ হিসেবে নেতৃস্থানীয় ভিন্নমতাবলম্বীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের গণতন্ত্রপন্থী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মিন কো নাইংকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

জানুয়ারি ২০০৭

সংখ্যালঘু ও বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর ওপর নির্যাতন বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। চীন ও রাশিয়া এতে ভেটো দেয়।

এপ্রিল ২০০৭

২৪ বছর পরে মিয়ানমার ও উত্তর কোরিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। মিয়ানমার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এই অভিযোগে যে মিয়ানমার ভ্রমণে আসা দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতিকে হত্যায় উত্তর কোরীয় এজেন্ট ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল।

মে ২০০৭

আরও এক বছরের জন্য সু চির গৃহবন্দী দশা বৃদ্ধি করা হয়।

আগস্ট ২০০৭

জ্বালানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাস্তায় নামে, যাকে অপরিপক্কভাবে 'স্যাফ্রন রেভল্যুশন' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২০০৭

১৪ বছরের সাংবিধানিক আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে বলে সামরিক সরকার ঘোষণা দেয় এবং জাতীয় সম্মেলন বন্ধ করে দেয়।

অক্টোবর ২০০৭

ব্যাপক সামরিক উপস্থিতিতে রেঙ্গুনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। অনেক ভিক্ষুকে গ্রেপ্তার করার পর তারা অনুপস্থিত হয়ে পড়ে।

জানুয়ারি ২০০৮

দেশে সিরিজ বোমা হামলা ঘটে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কারেন বিদ্রোহীসহ 'বিদ্রোহী ধ্বংসকারীদের' এর জন্য দায়ী করে।

এপ্রিল ২০০৮

সরকার প্রস্তাবিত নতুন সংবিধান প্রকাশ করে, যেখানে সংসদের এক-চতুর্থাংশ আসন সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং বিরোধী নেত্রী অং সান সু চির কার্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে।

নভেম্বর ২০০৮

গোপনে চলা অনেকগুলো বিচারকাজে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে ৬৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ২০০৮

মানবাধিকারকর্মীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও চারটি বিদেশি কোম্পানির একটি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে সরকার পার্শ্ববর্তী চীনে প্রাকৃতিক গ্যাস নেওয়ার জন্য পাইপলাইন স্থাপনে চুক্তি করে।

জানুয়ারি ২০০৯

থাইল্যান্ডের উপকূলে চলে আসা শত শত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমকে সে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। মিয়ানমার এসব সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কয়েক শ রোহিঙ্গাকে পরবর্তী সময়ে ইন্দোনেশিয়ার

উপকূলে নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়।

এপ্রিল ২০০৯

প্রধান বিরোধী দল এনএলডি সুপরিকল্পিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। শর্ত থাকে যে সরকার সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবে, সংবিধান পরিবর্তন করবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে কাজ করতে দেবে।

আগস্ট ২০০৯

মে মাসে একজন অনাকাঙ্ক্ষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে দেখা করায় সু চিকে গৃহবন্দী দশার শর্তভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা তিন বছরের কারাদণ্ড কমিয়ে ১৮ মাসের জন্য গৃহবন্দী করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২০০৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন সামরিক শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

অক্টোবর ২০০৯

সু চি মিয়ানমারের সামরিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং তাঁকে পশ্চিমা কূটনীতিকদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০১০

এনএলডির ভাইস চেয়ারম্যান টিন ওকে কর্তৃপক্ষ মুক্তি দেয়। সু চির এই সহকারী কারাগার বা গৃহবন্দী দশায় এক দশকেরও বেশি সময় পার করেন।

মার্চ ২০১০

সরকার ঘোষণা করে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচনী আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু একটি নির্বাচন কমিশনের যে বিধান ছিল, জান্তা তা পছন্দমতো বাছাই করে।

অক্টোবর ২০১০

সরকার দেশের পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং সরকারি নাম পরিবর্তন করে।

নভেম্বর ২০১০

সামরিক বাহিনী সমর্থিত দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) ২০ বছরের মধ্যে প্রথম নির্বাচনে বিজয়ী হয়। বিরোধী দল নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলে এবং নির্বাচনকে জাল অভিহিত করে নিন্দা জানায়। সু চিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। নির্বাচনের এক সপ্তাহ পরে গৃহবন্দী দশা থেকে সু চিকে

মুক্তি দেওয়া হয়।

মার্চ ২০১১

থেইন সেইন নতুন নামসর্বস্ব একটি বেসামরিক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।

সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রতিবাদের মুখে উত্তরাঞ্চলের কাচিন প্রদেশে বিতর্কিত চীনা হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্প থেকে সরকার সরে আসে।

অক্টোবর ২০১১

সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইউনিয়ন করতে দেওয়া প্রসঙ্গে নতুন শ্রম আইন পাস করা হয়।

নভেম্বর ২০১১

সু চির দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করলে তিনি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলেন।

জানুয়ারি ২০১২

সরকার কারেন নৃগোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করে। আংশিক মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল ২০১২

সংসদীয় উপনির্বাচনে এনএলডির প্রার্থীরা ভালো ফল করেন, সু চিও নির্বাচিত হন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বার্মার বিরুদ্ধে সব ধরনের বেসামরিক অবরোধ এক বছরের জন্য প্রত্যাহার করে।

জুন ২০১২

২৮ মে ২০১২ সালে রামরি পৌরসভায় তিনজন মুসলিম পুরুষ ২৮ বছর বয়সী একজন আরাকান নারীকে ধর্ষণ ও হত্যা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে জুন মাসে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জুনের ৩ তারিখে, রামরির দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত টাওনগপ শহরে আরাকানের গ্রামবাসীদের একটি বড় দল বাস থামিয়ে ১০ জন মুসলিমকে পিটিয়ে ঘটনাস্থলেই হত্যা করে।

আরাকান রাজ্যে স্থানীয় আরাকানীয় বৌদ্ধদের সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। আরও চারটি শহরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। ৮৮ জন মানুষের মৃত্যু এবং ৯০ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়ে

যাওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি থেইন সেইন জরুরি অবস্থা জারি করেন।

পরবর্তী সব বর্মি সরকারই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে। নতুন এনএলডি প্রশাসনও তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ 'ছিঁচকে চোর' বলে দাবি করে। বৌদ্ধ সংঘগুলোতে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এ ধরনের মনোভাব উসকে দেয়। তারা দাবি করে যে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যায় দেশ ভরে যাওয়ার হুমকি তৈরি হয়েছে।

জুলাই ২০১২

রাষ্ট্রপতি থেইন সেইন ইউএনএইচসিআরকে বলেন যে সরকার তাঁর দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে পারবে, কিন্তু 'সীমান্ত পার হয়ে আসা অবৈধ রোহিঙ্গা মুসলিম, যারা আমাদের জাতি নয় তাদের শনাক্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়'। তিনি বলেন যে রোহিঙ্গারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং তাদের 'নিতে আগ্রহী' এমন তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসন করতে হবে।

জুলাই ২০১২

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার নাভি পিল্লাই আরাকান/রাখাইন প্রদেশে মুসলিম, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানান।

আগস্ট ২০১২

জুন মাসের সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় মিয়ানমারে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক বিশেষ দূত থমাস ওজেয়া কুইন্টানা নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ স্বাধীনভাবে তদন্তের আহ্বান জানান।

আগস্ট ২০১২

পশ্চিমাঞ্চলে রাখাইন বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত যে সহিংসতায় বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটে তা তদন্তে রাষ্ট্রপতি থেইন সেইন একটি কমিশন গঠন করেন। মিয়ানমার সরকার গণমাধ্যমের ওপর থেকে প্রকাশপূর্ব সেন্সরশিপ তুলে নেয়।

সেপ্টেম্বর ২০১২

বার্মা তার দেশের ২ হাজার ৮২ জনের নাম কালো তালিকা থেকে বাদ দেয়।

ফলে ১৯৮৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের নেতা মো থি জুন নির্বাসন থেকে ফিরে আসেন।

অক্টোবর ২০১২

সিত্তিতে সর্ব-আরাকান ভিক্ষু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরাকানের বৌদ্ধ জনগণের ওপর ভিক্ষুদের খুবই উঁচুমানের নৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে। সেসব ভিক্ষু উগ্রভাবে একটি রোহিঙ্গাবিরোধী ফতোয়া জারি করে, যেখানে শহরতলিকে একতাবদ্ধ হয়ে এই 'সমস্যা' 'সমাধানে সাহায্যের' আহ্বান জানানো হয়।

আরাকান/রাখাইন প্রদেশের নয়টি পৌরসভায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুনরায় বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। এর ফলে আরও প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, যাদের বেশির ভাগই মুসলিম। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয় যে রোহিঙ্গা ও কামান মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অক্টোবরের এই হামলা সংগঠিত, প্ররোচিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে স্থানীয় আরাকানীয় রাজনৈতিক দলীয় গোষ্ঠী, বৌদ্ধ সন্ন্যাস এবং সাধারণ আরাকানের নাগরিকদের মাধ্যমে, যেখানে সময়ে সময়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী সহায়তা করেছে। রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, অনেককে গণকবরে পুঁতে রাখা হয়েছে এবং তাদের গ্রাম ও আশপাশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে ২৫ বছর বয়সী নির্যাতনের শিকার হয়েও বেঁচে যাওয়া একজন বলে, 'প্রথমে সেনারা আমাদের বলল, "তোমরা চুপ করে থাকো, আমরা তোমাদের রক্ষা করব," সে জন্যই আমরা তাদের বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু পরে তারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আরাকানের স্থানীয়রা সহজেই আমাদের পিটিয়েছে এবং হত্যা করেছে। নিরাপত্তারক্ষীরা আমাদের রক্ষা করেনি।'

আসিয়ানের মহাসচিব সুরিন পিটসুভান দাবি করেন যে আরাকান/রাখাইন প্রদেশে সহিংসতা দমনে আসিয়ান, জাতিসংঘ এবং সরকারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা শুরু করার জন্য আসিয়ানের দেওয়া প্রস্তাব মিয়ানমার সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে।

জুন থেকে সহিংসতায় ১ লাখ ২৫ হাজার রোহিঙ্গা ও অন্যান্য মুসলিম, এবং অল্পসংখ্যক আরাকানের স্থানীয় মানুষকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের (আইডিপি) ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত করে পাঠিয়েছে।

নভেম্বর ২০১২

১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের রাষ্ট্রহীন করা হয়েছে।

'রোহিঙ্গাদের সমান নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে' নাভি পিল্লাই মিয়ানমার সরকারকে সেই নাগরিকত্ব আইন পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মিয়ানমারের মানবাধিকার অবস্থা বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেখানে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে উদ্বেগ জানানো হয়। এ ছাড়া 'কাচিন প্রদেশে চলমান সশস্ত্র সংঘাত দমনে ও রাখাইন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ সহিংসতা এবং নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে' সরকারকে আহ্বান জানানো হয়।

আসিয়ানের ইন্টারপার্লামেন্টারি মিয়ানমার ককাস একটি বিবৃতি দেয়, যেখানে ২৬ নভেম্বরের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে এ-ও বলা হয় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের অস্বীকৃতি আন্তসম্প্রদায় উত্তেজনা ও সহিংসতার অবনতি ঘটাবে।

একজন বৌদ্ধ নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে রোহিঙ্গা পুরুষদের অভিযুক্ত করা হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, ২৮০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে এবং হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রোহিঙ্গাবিরোধী সহিংসতাকে 'জাতিগত নিধন অভিযানের' অংশ হিসেবে সংঘটিত 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা অধিক সংস্কারের বিনিময়ে 'বন্ধুত্বের হাত' বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সমঝোতা করার অনুরোধ জানান।

রোহিঙ্গা ও রাখাইন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গায় ১০০ জনেরও বেশি প্রাণ হারায়, যার অধিকাংশই রোহিঙ্গা। হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গাকে রাখাইনের ক্যাম্পে জোরপূর্বক পাঠানো হয়।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সামরিক বাহিনী কাচিন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সবচেয়ে বড় শহর লাইজা ঘিরে ফেলে। সরকার ও বিদ্রোহীরা যুদ্ধবিরতি ও চীনের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সংলাপ শুরু করতে রাজি হয়।

মার্চ ২০১৩

বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে আন্তসাম্প্রদায়িক সহিংসতা মিকতিলা শহর ছেয়ে ফেলে এবং আরও কিছু এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে অন্তত ৪০

জন নিহত হয় এবং ১২ হাজার বাস্তুচ্যুত হয়। রাষ্ট্রপতি থেইন সেইন মিকতিলায় জরুরি অবস্থা জারি করেন।

ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ছবিতে জুন ২০১২ সাল থেকে চলতে থাকা সহিংসতা ঘটেছে এমন ১৩টি পৌরসভার ৫টিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২৭টি অস্বাভাবিক ধ্বংস এলাকা খুঁজে পায়। সিত্তির আক্রান্ত এলাকার ছবিতে জুন ২০১২ সালে ঘটা ধ্বংসযজ্ঞে ২ হাজার ৫৫৮টি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা পাওয়া যায়। সহিংসতার এই খণ্ডচিত্র থেকে বোঝা যায় যে জুন থেকে আরাকান প্রদেশে অন্তত ৪ হাজার ৮৬২টি স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে, যা সব মিলিয়ে মূলত আবাসিক সম্পত্তির ৩৪৮ একর এলাকাব্যাপী বিস্তৃত।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে রাখাইন প্রদেশে সহিংসতার জন্য দায়ীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া কার্যকর মানবিক সহায়তা সহজতর করা এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বন্ধের দাবি জানানো হয়।

মুসলিম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় মিয়ানমারে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক বিশেষ দূত উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সহিংসতা ছড়িয়ে পড়া বন্ধে সরকারকে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে বৈষম্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ নিরসনে সরকার যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এপ্রিল ২০১৩

অস্ত্র অবরোধ ও অভ্যন্তরীণ দমন-পীড়নে ব্যবহৃত হতে পারে এমন যন্ত্রে অবরোধ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাকি সব ক্ষেত্রে মিয়ানমারের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়।

জুন ও অক্টোবর ২০১২ সালে রাখাইন প্রদেশে সংঘটিত সহিংসতার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার বিষয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় যে ২০১২ সালের জুনে রোহিঙ্গা ও কামান মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধমূলক কার্যক্রম মানবতাবিরোধী অপরাধের সমতুল্য এবং জাতিগত নিধনের অংশ হিসেবে এটা করা হয়েছিল।

রাখাইন প্রদেশে সংঘাত তদন্ত কমিশন জুন ও অক্টোবর ২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোয় মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং সব গোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

মে ২০১৩

প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন ওয়াশিংটন সফর করেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন, কিন্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার সমালোচনা করেন। মার্চ মাসে মিকতিলায় সহিংসতার জন্য ছয়জন মুসলিমকে জেলে পাঠানো হয়। কোনো বৌদ্ধ অভিযুক্ত হয়নি।

ওবামা মিয়ানমারের ওপর চলমান অবরোধ আরও এক বছর বাড়িয়ে দেন, কিন্তু ১৯৯৬ সালের ভিসা অবরোধ তুলে নেন।

রাখাইন প্রদেশের মংডু জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা পরিবারের ওপর দুই সন্তান পর্যন্ত সীমারেখা টেনে দেয়।

শান প্রদেশের লাসিওতে মুসলিমবিরোধী সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ রায়তকারীরা একটি মসজিদ, এতিমখানা এবং মুসলিমদের ব্যবসা ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১ হাজার ৪০০ মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

মিয়ানমারের মানবাধিকার অবস্থার বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ দূত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দুই সন্তান নীতি আরোপের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে এটা 'স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন, যেখানে একটি বিশেষ নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।'

জুন ২০১৩

রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা ও ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং জাতিসংঘের একটি মানবাধিকার কার্যালয় স্থাপনের জন্য সেখানে অনুরোধ করা হয়, যাতে করে মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যাপ্ত নজরদারি করা যায়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল মিয়ানমারে ব্যাপক আকারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, বিশেষ করে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের বিষয়ে। সেখানে সব ধরনের সহিংসতা বন্ধে ও রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদানে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

ইয়াঙ্গুনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধ নেতাদের সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি আন্তধর্মীয় বিবাহ আইন প্রস্তাব করেন। সেখানে বৌদ্ধ নারী মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা বলা হয়। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া এবং মুসলিম পুরুষকে

ধর্মান্তরিত হওয়ার বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়।

মিয়ানমার-বিষয়ক জাতিসংঘের আবাসিক ও মানবিক সমন্বয়ক অশোক নিগামের দাখিল করা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে রাখাইনে জুন ও অক্টোবর ২০১২ সালের সহিংসতা থেকে এই পর্যন্ত ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ ছাড়া ১৬৭ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং ১০ হাজার ভবন ধ্বংস করা হয়েছে।

নাভি পিল্লাই মিয়ানমারের সরকারকে নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চলমান বৈষম্য দমনে আহ্বান জানান।

ইসলামি সহযোগিতা সংগঠনের মহাসচিব একমেলেদ্দিন এহসানোগলু মিয়ানমার সরকারকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব ধরনের প্ররোচনা ও বৈষম্য অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর আরোপ করা দুই সন্তান নীতির ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা ভেঙে ফেলার ঘোষণা দেন। নাসাকার বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের বিচারবহির্ভূত হত্যা, যথেচ্ছাচার গ্রেপ্তার ও আটক, নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৪

মংডু ও রাখাইন প্রদেশের রাজধানী সিত্তেতে রোহিঙ্গাবিরোধী রাষ্ট্রীয় সহিংসতার নতুন ঢেউ শুরু হয়।

সিত্তির কাছে রোহিঙ্গা থে চুয়াং শরণার্থী শিবিরের জন্য একমাত্র সরকারি হাসপাতাল থেকে স্টাফ ও ওষুধপত্র প্রত্যাহার করে নেয়।

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন মুসলিম পুরুষ ও বৌদ্ধ নারীদের আন্তধর্মীয় বিয়ে বন্ধে আনীত বিলের প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন।

সরকার চিকিৎসা সাহায্য এনজিও মেডিসিন সানস ফ্রন্টিয়ার্সকে বহিষ্কার করে। এ ছাড়া উত্তর রাখাইন প্রদেশে সব ধরনের প্রাপ্তিসাধ্য জরুরি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যকরভাবে অপসারণ করে।

থাইল্যান্ড ঘোষণা করে যে তারা নভেম্বর ২০১৩ থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৩০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত পাঠিয়েছে।

মিয়ানমারের মানবাধিকার অবস্থাবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত সে দেশে তাঁর শেষ সফর সমাপ্ত করেন। তিনি 'রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্ররোচনা দিতে পরিচালিত অভিযান', মুসলিম সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করার

চলমান প্রক্রিয়া এবং মুসলিমদের নির্যাতনকারী ও হত্যাকারীদের দায়মুক্তির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রতিবাদকারীরা তার 'বাঙালি'প্রীতির ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং রোহিঙ্গা পরিচয় অস্বীকার করে।

মেডিকেল সানস ফ্রন্টিয়ার্সকে মিয়ানমার থেকে বহিষ্কারের পর তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা হাজার হাজার রোহিঙ্গা রোগীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে।

মার্চ ২০১৪

রাখাইন জাতীয়তাবাদীরা রোহিঙ্গাদের সহায়তাকারী বিদেশি সাহায্যকারীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

সরকারি তদন্ত কমিশন দু চি ইয়ার তান গ্রামের ঘটনার ওপর তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে মৃত্যুর 'কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি' এবং রোহিঙ্গাবিরোধী সহিংসতা ঘটেছে বলে যেসব অভিযোগ, তাও অস্বীকার করা হয়।

মিয়ানমারের মানবাধিকার-বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত তাঁর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয় যে রাখাইন প্রদেশে 'ব্যাপক বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে রাষ্ট্রীয় ও প্রদেশ পর্যায়ে কোনো স্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি' এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'যে ধরনের ব্যাপক ও পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে', বিশেষ করে ২০১২ সালের জুন থেকে, তা মানবতাবিরোধী অপরাধের সমতুল্য।

বৌদ্ধ গোষ্ঠীগুলো সিত্তেতে কাজ করা আন্তর্জাতিক সাহায্য গোষ্ঠী ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর কার্যালয় ও কর্মীদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ চালায়। প্রায় ১২০ জনেরও বেশি কর্মী সাময়িকভাবে সেই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল 'মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি'র ওপর সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, বিশেষ দূতের আজ্ঞা আরও এক বছর বৃদ্ধি করে, রোহিঙ্গা ও অন্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির ব্যাপারে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ অব্যাহত রাখে এবং সব সহিংসতা ও নির্যাতনের স্বাধীন তদন্তের অনুরোধ করে।

আন্তধর্মীয় বিয়ের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞাবিষয়ক প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য মানবাধিকার-বিষয়ক আসিয়ানের সাংসদদের সংগঠন এপিএইচআর মিয়ানমারের আইনপ্রণেতাদের আহ্বান জানায়। আসিয়ানের সাংসদেরা খসড়া আইনকে 'বৈষম্যমূলক' এবং 'স্বাধীনতা ও ধর্মীয় বিশ্বাসবিষয়ক মৌলিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সরাসরি

সাংঘর্ষিক' বলে আখ্যায়িত করে।

মিয়ানমার ১৯৮৩ সালের পর প্রথম আদমশুমারি পরিচালনা শুরু করে এবং ঘোষণা করে যে তারা রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না।

এপ্রিল ২০১৪

তিন দশকের মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মিয়ানমারের ২০১৪ সালের আদমশুমারিতে মুসলিমদের 'রোহিঙ্গা' হিসেবে নিবন্ধন করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়াবলি সমন্বয়ের কার্যালয় প্রতিবেদনে বলে যে সিত্তি আক্রমণের পরে সহায়তায় বিঘ্ন ঘটায় রাখাইনে মানবিক কার্যক্রম 'গুরুতরভাবে আক্রান্ত' হয়েছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল বলে যে দেশটির আদমশুমারি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ গণনা করা হয়েছে। রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং কাচিন প্রদেশে কাচিন স্বাধীনতা সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন মানুষের গণনা করা সম্ভব হয়নি।

উত্তরে সরকারি সৈন্য ও কাচিন বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে অন্তত ২২ জন মানুষ নিহত হয়।

মে ২০১৪

যুক্তরাষ্ট্র আরও এক বছরের জন্য কিছু নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করে। বলা হয় যে সাম্প্রতিক কালে সংস্কার হলেও অধিকার হরণ এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব রয়ে গেছে।

লন্ডনের কুইন মেরি কলেজের গবেষণা দল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে চিঠি লেখে: রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য বৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় চর্চা রুয়ান্ডা, জার্মানি ও বসনিয়ায় ব্যাপক আকারে হত্যার সময়ের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করছে।

জুন ২০১৪

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর বলে যে যেসব রোহিঙ্গা ও অন্য মুসলিমরা আরাকান প্রদেশে সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে বাঁচতে নৌকায় করে পালিয়েছে তাদের ওপর চালানো নির্যাতন ও শোষণের ক্রমবর্ধমান খবর সংস্থাটির কাছে আসছে। সংস্থাটি আরও বলে যে ২০১২ সাল থেকে ৮৬ হাজারেরও বেশি মানুষ নৌকায় চড়ে পালিয়েছে, যার মধ্যে ২০১৩ সালব্যাপী পালিয়েছে ৫৫ হাজার এবং জানুয়ারি ও এপ্রিল ২০১৪ সালে ১৫ হাজার।

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তাবিষয়ক সহকারী সমন্বয়ক কিয়ুং-ওয়া ক্যাং বলেন যে সাহায্যকর্মীদের ওপর মার্চ মাসের আক্রমণের পর আরাকানে চলমান মানবিক সহায়তা কমিউনিটির বর্তমান সক্ষমতা 'এখনো আগের তুলনায় ৬০ শতাংশ কম'।

মিয়ানমারে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু বিষয় ও মানবাধিকার পরিস্থিতিবিষয়ক জাতিসংঘের তিনজন বিশেষ দূত 'ধর্মান্তরিতকরণ' বিষয়ে নেওয়া খসড়া বিল বাতিলে মিয়ানমার সরকারকে আহ্বান জানান। তাঁরা সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে এই বিল ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুবিরোধী বৈষম্য সৃষ্টি করবে এবং 'মানবাধিকারকে সম্মান জানানো ও রক্ষা করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হওয়ার পথ থেকে মিয়ানমারের বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে।'

এপিএইচআর বলে যে মিয়ানমার সরকার মেডিকেল সানস ফ্রন্টিয়ার্সকে বহিষ্কার করার ফলে অনেক রোহিঙ্গা প্রতিরোধযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করেছে।

জুলাই ২০১৪

মান্দালায় মুসলিমদের দোকান, বাড়ি ও একটি মসজিদ আক্রমণ করা হয়। দুজন নিহত হয়।

আগস্ট ২০১৪

ইউএনএইচসিআর তাদের প্রতিবেদনে বলে যে ২০১২ সালে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় প্রায় ৮৭ হাজার মানুষ রাখাইন প্রদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালিয়েছে, যাদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গা। এ সময়ে অন্তত ২০০ মানুষ নিহত হয়।

অক্টোবর ২০১৪

মিয়ানমারে জাতিসংঘের বিশেষ দূত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি মিয়ানমারের সংস্কার-প্রক্রিয়ার উল্টোরথের নজির বিষয়ে সতর্ক করে দেন। এর মধ্যে রাখাইন প্রদেশে 'ব্যাপক গোলমেলে' পরিস্থিতির কথাও বলেন, যেখানে 'চলাফেরার স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপ করায় স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকা, পানি, খাদ্য ও পয়োনিষ্কাশনের মতো মৌলিক অধিকার মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে'। এ ছাড়া 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীবিরোধী বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাসে মানবাধিকার লঙ্ঘন যোগ হয়েছে।'

অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫ সালে সংসদ নির্বাচন ধার্য করা হয়। সরকার ৩ হাজার বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করে। মিয়ানমারের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা

ব্যক্তিরা বলেন যে এসব বন্দীর মধ্যে সাবেক সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও রয়েছেন, যাঁরা ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী খিন নিন্তের সঙ্গে কারাবন্দী হয়েছিলেন।

নভেম্বর ২০১৪

নে পাই তাওয়ে পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামা গণমাধ্যমকে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র 'একটি নতুন পরিকল্পনা দেখতে চায় যেখানে আত্মচিহ্নিতকরণ ছাড়াই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।'

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সেখানে মিয়ানমার সরকারকে চলাফেরার স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ নাগরিকত্বে সমান অধিকার এবং রোহিঙ্গাদের জন্য আত্মচিহ্নিতকরণের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানায়।

জানুয়ারি ২০১৫

রাখাইন ন্যাশনাল পার্টির মুখপাত্র সাক্ষাৎকারে বলেন যে 'যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের (রোহিঙ্গা) অনেক বেশি খাদ্য ও দান প্রদান করবে, তখন তারা আরও বেশি মোটা ও শক্তিশালী হবে এবং তারা আরও বেশি সহিংস হবে।'

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

চীন সীমান্তে শান প্রদেশে কোকাং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন সৈন্য নিহত হয়। সরকার কোকাং অঞ্চলে সাময়িকভাবে মার্শাল ল জারি করে।

প্রস্তাবিত সাংবিধানিক গণভোটকে সামনে রেখে বৌদ্ধদের রাস্তায় বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মুসলিম রোহিঙ্গাদের দেওয়া সাময়িক ভোটাধিকার প্রত্যাহার করে নেয়।

মার্চ ২০১৫

মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতিবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত তাঁর সফর শেষে এক বিবৃতিতে বলেন যে আটক মুসলিম উদ্বাস্তুদের 'ব্যাপক অধিকার সীমিতকরণ' করা হয়েছে, যেখানে 'অপরিহার্য সেবাগুলোও' রয়েছে। তিনি 'রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের পরিপূর্ণ নাগরিকত্বে সমান অধিকার দেওয়ার' দাবি পুনরায় ব্যক্ত করেন।

অনেক রোহিঙ্গার কাছে থাকা পরিচয়পত্র (সাদা কার্ড) মিয়ানমার সরকার অবৈধ ঘোষণা করে। সরকার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী বলে আখ্যায়িত করে তাদের 'বাঙালি' হিসেবে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনে বাধ্য করে।

সরকার ও ১৬টি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মে ২০১৫

লন্ডনভিত্তিক কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দল প্রতিবেদনে বলে যে আগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্রাবস্থায় বসবাস করা ১ লাখ মুসলিমকে সিত্তির উপকণ্ঠে জনবহুল ও বিচ্ছিন্ন আটককেন্দ্রের নোংরা শিবিরে জোরপূর্বক পাঠানো হয়েছে। আরও ৪ হাজার ২৫০ জন রোহিঙ্গা সিত্তি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অং মিঙ্গালার নামক সামরিক ঘাঁটিতে নিরাপত্তাহীনভাবে বেঁচে আছে।

শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সঙ্গে মিলে লগবগে নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো তাদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতিসংঘ সে দেশগুলোর সমালোচনা করে।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে নৌকায় অসহায় অভিবাসী ও শরণার্থীদের সুরক্ষা দিতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের নেতাদের অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া নৌকা থেকে তাদের নিরাপদে উদ্ধার ও জীবন রক্ষা, অধিকার রক্ষা ও মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতেও সেসব দেশের নেতাদের অনুরোধ করা হয়।

তথাকথিত 'জাতি ও ধর্ম রক্ষা' চারটি বিলের প্রথমটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্যসেবা বিল আইনে পরিণত করায় জাতিসংঘের পাঁচজন বিশেষ দূত সতর্কতা জারির মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয় যে 'এই বিল বিশেষ করে নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং দেশে বিদ্যমান উত্তেজনা বাড়াতে পারে।'

আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধীর গণহত্যা সংঘটন করা হচ্ছে' বলে সতর্ক করে দেন।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের নির্যাতন বন্ধে অসলো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ২০১৫

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও পক্ষপাত ছড়ানো বন্ধের দাবি জানানো হয়।

অক্টোবর ২০১৫

মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতিবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে 'মানবাধিকার-বিষয়ক পূর্ববর্তী উদ্বেগগুলোর কোনো বড় ধরনের অগ্রগতি পাওয়া যায়নি, বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য।'

নভেম্বর ২০১৫

মিয়ানমারে ১৯৯০ সালের পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল এনএলডি সংসদীয় নির্বাচনে সরকার গঠনের জন্য পর্যাপ্ত আসন লাভ করে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ইউএনএইচসিআর এক প্রতিবেদনে বলে, ২০১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার মানুষ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছে, যাদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গা মুসলিম।

মার্চ ২০১৬

হিন কোয়াও প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ৫০ বছর সামরিক শাসনের পর সু চির গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষমতা গ্রহণ করায় একটি 'নতুন যুগের' সূচনা ঘটে।

অক্টোবর ২০১৬

শত শত ইসলামি উগ্রবাদী তিনটি সীমান্তরক্ষীদের চৌকিতে হামলা করে নয়জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে বলে পুলিশ দাবি করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ দাবি করেছিল আক্রমণকারীদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে বিলুপ্ত থাকা উগ্রবাদী গোষ্ঠী হিসেবে তকমা পাওয়া রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের সংযোগ রয়েছে। সেই এলাকাকে 'সন্ত্রাসবিরোধী জোন' ঘোষণা করা হয়। পরে সরকার দাবি করে যে আক্রমণকারীরা আকা-মুল-মুজাহিদিন নামে একটি জিহাদি গোষ্ঠীর সদস্য, যার নেতাকে পাকিস্তানে তালেবানরা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কয়েক দিন পরে ভারত ভ্রমণে গিয়ে *হিন্দুস্তান*

*টাইমস*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সু চি দাবি করেন যে এটা শুধু একটি উৎস থেকে পাওয়া একটি তথ্য, আমরা এটাকে চূড়ান্তভাবে সঠিক হিসেবে ধরে নিতে পারি না।

উত্তর আরাকান প্রদেশের মংডু, বুথিডং ও রাথিডং শহরের আশপাশে সৈন্য সমাবেশ করা হয়। আবদ্ধ পরিস্থিতির কয়েক দিনের মাথায় প্রদেশের রাজধানী সিত্তিতে ৮ শতাধিক আরাকানের বৌদ্ধ জড়ো হয়। ১২০০-এর বেশি মুসলিম তাদের গ্রাম ছেড়ে পালায় এবং বুথিডং শহরে আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে খবর আসে যে বৌদ্ধদের নিরাপত্তার কারণে হেলিকপ্টারে করে সরানো হয়। প্রথম আক্রমণের পর এক ডজনেরও বেশি মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় বলে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় বলা হয়।

মিয়ানমার টাইমস-এর জন্য কাজ করা স্কটিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিক ফিওনা ম্যাকগ্রেগর প্রতিবেদনে বলেন যে অপারেশন জোনে বার্মার নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে অধিকারকর্মীরা নিশ্চিত করেছেন। এই প্রতিবেদনের পর 'পত্রিকার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে' বলে ম্যাকগ্রেগরকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর সম্পাদক ডগলাস লংকে সাংবাদিক রক্ষার্থে করা কমিটির প্রতিনিধির কাছে এ ঘটনার কথা বলার দুই সপ্তাহ পরে বরখাস্ত করা হয় এই বলে যে তিনি 'পত্রিকার মিশন নষ্ট করেছেন'।

নভেম্বর ২০১৬

আরাকান প্রদেশের পুলিশপ্রধান সেইন লুইন বলেন যে স্থানীয় পুলিশ অমুসলিম অধিবাসীদের একটি বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীকে সশস্ত্র করবে ও প্রশিক্ষণ দেবে। আইনজীবীদের আন্তর্জাতিক কমিশন এটাকে 'দুর্যোগের কৌশল' হিসেবে আখ্যায়িত করে। *রয়টার্স* এক প্রতিবেদনে বলে যে এই পরিকল্পনা ইতিমধ্যে প্রদেশের রাজধানী সিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মংডুর কাছের গ্রামগুলোয় বার্মার সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। দুই দিনে এই সহিংসতায় আনুমানিক ১৫ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক এই ঘটনাকে বর্ণনা করেন 'ফোর কাট' কৌশল হিসেবে। দেশটির অসংখ্য সশস্ত্র নৃতাত্ত্বিক বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দশকের পর দশক এই কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

বার্মার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ট্রু নিউজ ইনফরমেশন টিম অব ডিফেন্স সার্ভিস চালু করে, যা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গণমাধ্যমে হতাহত ও সম্পদ ধ্বংস-সম্পর্কিত

খবরের 'জালিয়াতি' যাচাই করবে। কমপক্ষে একজন মুসলিম সাংবাদিক হত্যার হুমকিসহ ইন্টারনেট হয়রানির শিকার হয়।

ডিসেম্বর ২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামা মিয়ানমারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এই বলে যে দেশটি মানবাধিকার বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। রোহিঙ্গাদের ওপর হামলার মধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে অপরিপক্ব বলে আখ্যায়িত করে।

আগস্ট ২০১৭

রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা ৩০টি পুলিশ স্টেশনে হামলা করে। এর ফলে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু হয়। হাজার হাজার রোহিঙ্গা রাখাইন প্রদেশ থেকে পালিয়ে যায়।

সেপ্টেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ শুরুতে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিজিবি) রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত দিয়ে বয়ে চলা নাফ নদী অতিক্রম করার সময় শত শত রোহিঙ্গা মারা যায়।

যখন নাফ নদীতে মৃত শিশু ও ডুবে যাওয়া নৌকার ছবি প্রচারিত হয়, তখন বাংলাদেশের ভেতর থেকে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। সরকার অবস্থান বদলে রোহিঙ্গাদের দেশের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। সংকট দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে। জাতিসংঘ জরুরি অধিবেশন আহ্বান করে, কিন্তু চীন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেয় যে তারা যেকোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দেবে।

সু চি নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেন, 'এই ধরনের ভুয়া তথ্য...বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমস্যা তৈরির লক্ষ্যে এবং সন্ত্রাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত বিকৃত তথ্যের বিরাট তুষারস্তূপের চূড়ামাত্র।'

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে ১ লাখ ২৫ হাজার রোহিঙ্গা শুধু হেঁটেই বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। জাতিসংঘের দ্বিতীয় আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী রাখাইন প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। তাদের খাদ্য বা পানির কোনো সুবিধা নেই।

জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়ে বলে যে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা সহিংসতা থেকে বাঁচতে মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছে।

সেই বিবৃতিতে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য সরবরাহে সংগঠনটির জরুরি অর্থসংকটের সতর্কতা দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ বেসরকারি হিসাবে বলা হয়েছে, নতুন করে শরণার্থী রোহিঙ্গার সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়াতে পারে।

বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গারা ধর্ষণ, বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক হারে পুরুষ, নারী ও শিশু পুড়িয়ে মারার কথা বলেছে। ভূ-উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে রোহিঙ্গা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বামপন্থী রাজনৈতিক দল গণসংহতি আন্দোলন ঢাকায় জাতিসংঘের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি নিলে পুলিশ তা বানচাল করে দেয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসী জুম্মরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তিন দশকব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের কারণে প্রতিশোধ আক্রমণের শঙ্কায় ভুগছে। ২০১২ সালে রামু আক্রমণের মতো ঘটনার আশঙ্কায় জুম্ম আন্দোলনকর্মীরা চিন্তিত।

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক প্রধান রোহিঙ্গা মুসলিমদের 'টেক্সটবুক' জাতিগত নিধনের দায়ে মিয়ানমারকে অভিযুক্ত করেছে।

লেখাটি আলাল ও দুলাল কালেক্টিভ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন একটি লেখক মোর্চা এই আলাল ও দুলাল কালেক্টিভ। এই মোর্চা তৈরি পোশাকশিল্পে নিরাপত্তাহীন শ্রমিক, মধ্যপ্রাচ্যে অসহায় অভিবাসী শ্রমিক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম বিষয়ে লেখালেখি করে থাকে।

* অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

প্রতি আন্তর্জাতিক চিন্তা

গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী শ্রীলঙ্কা
দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকটের স্বরূপ

আলতাফ পারভেজ

> 'সকল যুদ্ধই তার পায়ের ছাপ রেখে যায় রাষ্ট্র ও সমাজের অলিগলিতে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যেন এটা ঘটেছে অধিকমাত্রায়। সেখানে শুধু এটা পায়ের ছাপ আকারে নেই। এ যেন দীর্ঘ এক স্থায়ী ছায়া। পুরো দেশেই কেবল নয়, প্রতিটি মননে পড়েছে এই যুদ্ধের ছায়া।'
>
> —মোহন কে. টিক্কু, সাংবাদিক, লেখক[১]

সারসংক্ষেপ

আফগানিস্তান থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল দশকের পর দশক জাতিগত সংঘাতে জ্বলছে, পুড়ছে—আবার জ্বলছে। প্রতীকী হিসেবে নিলে শ্রীলঙ্কার তামিল সংকটের পূর্বাপর কমবেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব নিপীড়িত জাতিসত্তারই 'গল্প'। বিস্ময়কর হলেও সত্য ২৬ বছর স্থায়ী যুদ্ধের পূর্বে যেভাবে এই সংকটের বিস্তার—তথাকথিত 'চূড়ান্ত যুদ্ধ' শেষেও তার সমাপ্তি ঘটেনি। একইভাবে আমরা দেখব অস্থিরতার অবসান হয়নি আফগানিস্তানের হাজারা এলাকায়, পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে, ভারতের কাশ্মীরে, মিয়ানমারের আরাকানে, নেপালের তরাইয়ে—এমনকি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও। বস্তুত জাতি সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোতে 'প্রবল সংস্কৃতি'র রাজনীতিবিদদেরই সেই 'সমাধান' খুঁজে পেতে হয়। শ্রীলঙ্কার সিংহলি রাজনীতিবিদেরা ৭০ বছর হলো সেই সমাধান হাতড়াচ্ছেন। তাঁদের অর্জন ও ব্যর্থতা থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সবার জন্য বিশেষ বার্তা আছে বলেই মনে হয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

রাষ্ট্র, তামিল, সিংহলি, তামিলনাড়ু, বহুত্ববাদ, হোমল্যান্ড, লোকগণনা, এথনো পলিটিকস, রাজাপক্ষে, চীন, এলটিটিই, ফনসেকা, হাইসিকিউরিসিটি জোন, উইগেনেশরন, জেভিপি, ইলম, সিরিসেনা, ফ্রিডম পার্টি, ন্যাশনালিস্ট পার্টি

ভূমিকা

শ্রীলঙ্কায় সিংহলি বনাম তামিল গৃহযুদ্ধের কাহিনি দক্ষিণ এশিয়ার এক পুরোনো দুঃখগাথা। তবে ২০০৯ সালে লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) পরাজয়ের পর থেকে দেশটিতে তামিল জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তা এবং তার সমাধানে বা মোকাবিলায় সরকারের কর্মকাণ্ড নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। শ্রীলঙ্কায় এখন তামিল সশস্ত্রতা না থাকলেও জাতীয় রাজনীতি আন্দোলিত হচ্ছে জাতিগত বিষয় নিয়েই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবাই তাকিয়ে আছে শ্রীলঙ্কার নীতিনির্ধারকেরা তাঁদের জাতিগত বিবাদ কীভাবে মীমাংসা করেন, সেদিকে। বলাবাহুল্য, এসব প্রত্যাশার পাশাপাশি অনেকেই নজর রাখছেন দেশটির মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতির দিকেও। বর্তমান লেখায় শ্রীলঙ্কার সর্বশেষ পরিস্থিতির একটি চুম্বকচিত্র তুলে ধরা হলো।

জনমিতি ও রাজনীতির অভিমুখ

দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে রাষ্ট্রীয় লোকগণনায় রাজনীতির প্রবল আঁচ থাকে। শ্রীলঙ্কায় সেই আঁচ বিশেষভাবে ভয়াবহ। এ বিষয়ে শ্রীলঙ্কার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় পেরাদিনিয়ার সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক কলিঙ্গ টুডর সিলভা একদা মন্তব্য করে বলেছিলেন,

> লোকগণনা যে প্রক্রিয়ায় হচ্ছে তাতে মানুষকে তার মানবিক পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে খুবই সীমাবদ্ধ এক বর্ণ ও জাতিগত পরিচয়ে ঠেসে ধরা হচ্ছে। আবার (শ্রীলঙ্কার) লোকগণনার পুরো প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে জাতিগত সমীকরণের বিরাট এক পাঠ্যে পরিণত হয়েছে। শুমারি প্রতিবেদন এখানে জাতিগত সংঘাতের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কোন জাতিসত্তা কোন অঞ্চলে সংখ্যায় কত বড় এবং কত ছোট তা যেমন লোকগণনার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে, তেমনি গণনা প্রতিবেদনও জাতিগত সংঘাতকে প্রভাবিত করছে।[২]

ফলে এই আলোচনার শুরুতে আমরা দেশটির লোকগণনার সর্বশেষ চিত্রটির একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। দেশটিতে সর্বশেষ লোকগণনা হয়েছে ২০১২ সালে।

১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কায় মোট জনসংখ্যার ৬৯.২৯ শতাংশ ছিল বৌদ্ধ। আর ২০১২ সালে মোট জনসংখ্যার ৭০.১৯ শতাংশ হলো বৌদ্ধ। এ থেকে ধারণা করা যায়, দেশটিতে ভবিষ্যতের আর্থসামাজিক নীতিনির্ধারণে বৌদ্ধধর্মীয় প্রভাব কোনোভাবেই অগ্রাহ্যযোগ্য নয়।

অন্যদিকে ১৯৮১ সালে দেশটির জনসংখ্যার ১৫.৪৭ শতাংশ ছিল হিন্দু। ৭.৫৫ শতাংশ ছিল মুসলমান এবং ৭.৬১ শতাংশ ছিল যৌথভাবে ক্যাথলিক ও খ্রিষ্টান।[৩] অর্থাৎ তিন দশক আগে অ-বৌদ্ধ তথা সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনসংখ্যার সম্মিলিত হিস্যা ছিল দেশটিতে ৩০.৬৩ শতাংশ।

আর ২০১২ সালে মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের হিস্যা দাঁড়িয়েছে ১২.৫৮ শতাংশ, মুসলমানদের ৯.৬৬ শতাংশ এবং যৌথভাবে ক্যাথলিক ও খ্রিষ্টান ৭.৬২ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১২ সালে সর্বমোট অ-বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২৯.৮৬ শতাংশ।

অর্থাৎ দেশটিতে তিন দশক পরও অ-বৌদ্ধধর্মীয় জনসংখ্যা প্রায় একই হিস্যায় বহাল রয়েছে, যা দেশটির বহুত্ববাদী ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের স্মারক। এ থেকে এ-ও অনুমিত হয়, দেশটিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবি প্রবল থাকবে এবং দেশটির মানব-নিরাপত্তার জন্য আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি এক জরুরি শর্ত।

শ্রীলঙ্কায় প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে মুসলমানরা। কিন্তু গত তিন দশকে তাদের সংখ্যাগত বৃদ্ধির হার অন্য তিন সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিক। ত্রিশ বছরের ব্যবধানে প্রতি ১০০ মুসলমান বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫ জন হয়েছে। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি প্রতি ১০০ জনে ১৩৩ জন। 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের জন্মহার অধিক হয়'—এটা সেই তত্ত্বকে প্রমাণ করছে। আবার একই সঙ্গে এ-ও ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতে দেশটিতে এ সম্প্রদায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে, যদিও তারা রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি অসংগঠিত এখনো।

সর্বশেষ লোকগণনায় দেশটিতে অঞ্চলভিত্তিক জটিল এক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা গেছে। দেশটিতে ২৫টি জেলা রয়েছে। তার মাঝে সর্বদক্ষিণের হামবানতোতায় প্রায় ৬ লাখ জনসংখ্যায় ৯৭ ভাগই বৌদ্ধ। এই জেলায় ১৯৮১ সালে হিন্দু ছিল ২ হাজার। সর্বশেষ গণনায়, ২০১২ সালে আছে ১ হাজার। আবার একেবারে উত্তরের এলাকা জাফনায় প্রায় ৫ লাখ ৮৪ হাজার জনসংখ্যায় প্রায় ৮৩ শতাংশই হিন্দু। এই জেলায় ১৯৮১ সালে বৌদ্ধ ছিল প্রায় ৫ হাজার। বর্তমানে আছে ২ হাজার। ১৯৮১ সালে এখানে মুসলমান ছিল ১৪ হাজার, ২০১২ সালে ছিল ২ হাজার মাত্র। উপরিউক্ত চিত্র থেকে বলা যায়, দেশটিতে বহুধর্মীয় বর্ণিলতা থাকলেও অঞ্চলগুলো সেই চিত্র ধারণ করে না। বরং অঞ্চলগুলোতে একক ধর্মীয় আধিপত্য দৃঢ়তা পাচ্ছে। ফলে অনিবার্যভাবেই অঞ্চলগত রেষারেষি বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে এবং ইতিমধ্যে দেশটির জাতিগত বৈরিতা একটি আঞ্চলিক রূপ নিয়েও উপস্থিত।

শ্রীলঙ্কার উপরিউক্ত জনমিতিক গতিধারা তামিল[৪] জাতীয়তাবাদীদের জন্যও একটি খারাপ বার্তা দিচ্ছে। তামিলরা বরাবর উত্তর ও পূর্বাঞ্চলকে (নর্দান ও ইস্টার্ন প্রভিন্স) নিজেদের ঐতিহাসিক 'হোমল্যান্ড' দাবি করে এবং তার সপক্ষে এই দুই প্রদেশের জনসংখ্যায় নিজেদের আধিক্যকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে। এ ক্ষেত্রে তুলনার জন্য পূর্বাঞ্চলের প্রধান দুটি শহর ত্রিংকোমালি ও বাত্তিকালোয়াকে যদি উদাহরণ হিসেবে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা দেখব, ১৯৮১ সালে পূর্বাঞ্চলের এই

দুই জেলায় 'শ্রীলঙ্কার তামিল' ছিল প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ। কিন্তু ২০১২ সালে তা দাঁড়িয়েছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ শতাংশ। প্রদেশটির তৃতীয় শহর আমপারাইয়ের জনসংখ্যাকে যুক্ত করলে তামিলদের হিস্যা আরও কমে যায়। কারণ, আমপারাইয়ে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্বাঞ্চলে নিজেদের সংখ্যাগত ক্রমাবনতির এই প্রবণতা এ প্রদেশকেও 'হোমল্যান্ড'ভুক্ত দাবি করা তামিলদের জন্য কঠিন করে তুলছে।

উপরিউক্ত জনমিতিক চিত্র শ্রীলঙ্কায় একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলমান প্রদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের (ইস্টার্ন প্রভিন্সের) তিন জেলা ত্রিংকোমালি, আমপারা ও বাত্তিকালোয়ায় ১৯৮১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল প্রদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩২.৫৪ শতাংশ। সর্বশেষ শুমারিতে দেখা যাচ্ছে, এই হিস্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। স্পষ্টত পূর্বাঞ্চলের তিন শহরেই মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। এই প্রবণতা এই প্রদেশকে শ্রীলঙ্কার মুসলমান রাজনীতির ভরকেন্দ্র করে তুলবে। নর্দান প্রভিন্স যেভাবে তামিল রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে আছে।

জাতিগত সমীকরণের পরিবর্তনশীলতার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার জনমিতি আর্থসামাজিক কিছু পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দেয়। দেশটির বাণিজ্যিক রাজধানী কলম্বো। ১৯৮১ সালে এই শহরে বসবাস করত জাতীয় জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ। সর্বশেষ শুমারিকালেও প্রায় অনুরূপ হার দেখা গেছে। ২৫টি জেলার দেশে একটি জেলাতেই নয় ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যার উপস্থিতি (আয়তনে যে জেলা পুরো দেশের ১ শতাংশ মাত্র) বাংলাদেশের মতোই প্রধান শহরে অতি ঘন বসবাসের ইঙ্গিতবহ এবং দেশে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ারও বাস্তব ফল এটা।

শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ চলেছে প্রায় ২৬ বছর। যুদ্ধ জনসমাজে কিরূপ অমানবিক কামড় বসিয়েছে, তারও ছাপ রয়েছে এই শুমারি-তথ্যে। ২৬ বছর স্থায়ী গৃহযুদ্ধের অন্যতম মূল ভরকেন্দ্র ছিল নর্দান প্রভিন্স। এই প্রদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হলো জাফনা ও মান্নার।

ত্রিশ বছরের শুমারি-তথ্যের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হলো দেশটির ২৫টি জেলার মধ্যে কেবল দুটিতে জনসংখ্যা ১৯৮১ সালের চেয়েও কমে গেছে ২০১২ সালে। অর্থাৎ বাকি ২৩ জেলায় জনসংখ্যা বাড়লেও জাফনায় তা কমে গেছে ৩০ শতাংশ ও মান্নারে কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ। পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় এমন অঞ্চল বিরল যেখানে ত্রিশ বছরের ব্যবধানে লোকসংখ্যা কমেছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার তামিল-অধ্যুষিত এলাকায় এটা ঘটেছে। দেশটির অবিশ্বাস্য এই পরিস্থিতির দায় অবশ্যই সংখ্যাগুরু সিংহলিদেরই।

সংবিধান প্রণয়নের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ : ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ

এটা সত্য, শ্রীলঙ্কায় এখন আর 'যুদ্ধ' নেই। তবে রয়ে গেছে যুদ্ধের প্রগাঢ় ছায়া। সেখানে যুদ্ধোত্তর সরকারগুলো এখন লড়ছে সেই ছায়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু যেকোনো দেশের 'সরকার'ই হলো সেই দেশের সংবিধানের 'সৃষ্টি'। সে কারণেই আজকের শ্রীলঙ্কায় বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে মূলত সংবিধান। ২০০৯ সাল থেকে সৃষ্ট রাজনীতির নতুন বাস্তবতায় সবার নজর সাংবিধানিক পরিবর্তনের পানে।

যুদ্ধ শেষে শ্রীলঙ্কায় নতুন সামরিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে তা নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতারও পটভূমি তৈরি করেছে। সামরিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভারত এখন জোর দিচ্ছে তামিল সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর। দিল্লির সরকারের এই নীতিই সমর্থন করছেন তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদেরাও।[৫] অনেকটা ভারতীয় চাপেই শ্রীলঙ্কা সরকার দেশটিতে নতুন সংবিধান রচনায় উদ্যোগ নিয়েছে। তামিলদেরও এটা প্রধান একটা দাবি ছিল।

এটা অনেকেই জানেন যে স্বাধীনতার পর দেশটিতে দুদফা সংবিধান প্রণয়নের বড় ধরনের উদ্যোগ দেখা গেছে। সর্বশেষ সংবিধান তৈরি হয় ১৯৭৮ সালে। কিন্তু দেশটির নাগরিকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক ঐক্যের ঘাটতি রয়েছে, তার জন্য এত দিনকার সংবিধানগুলোকেও দায়ী করা হয়। কারণ, এই সংবিধান নাগরিকদের মধ্যে কোনো একক দেশজ পরিচয় (Sri Lankan identity) তৈরি করতে পারেনি। এ বাস্তবতাতেই বর্তমানে, এই প্রবন্ধ রচনাকালে, দেশটিতে নতুন করে আরেক দফা সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লেখা প্রকাশের আগেই সেই সংবিধানও প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান সংবিধানের ১৯তম সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে ২০১৫ সালের এপ্রিলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই পার্লামেন্টকেই 'সাংবিধানিক সভা' হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং সম্ভাব্য সংস্কার প্রস্তাব তৈরির জন্য ২০ সদস্যের একটি কমিটিও করে দেওয়া হয়।

শুরু থেকে এই উদ্যোগের মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সরকার স্পষ্ট করে কখনো বলেনি যে তারা পুরোপুরি একটা নতুন সংবিধান তৈরি করতে যাচ্ছে, নাকি পুরোনো সংবিধানের সংস্কার করতে চাচ্ছে। তবে সরকারের ইতিমধ্যে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বর্তমান সংবিধানে তিনটি মৌলিক পরিবর্তন আনতে আগ্রহী তারা। একটি হলো তামিল-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আরও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া; দ্বিতীয়টি হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন এবং তৃতীয়টি হলো ভোটের পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন—যার ফলে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়ে। এরূপ সব পরিবর্তনকে নীতিনির্ধারক প্রস্তাবকেরা 'অতীত ভুলের সংশোধন' হিসেবে দেখছেন এবং মনে করছেন এর মাধ্যমে

জাতিগত স্বার্থের সমন্বয় ঘটবে এবং ঐতিহাসিক জাতিবিদ্বেষ কমে আসবে। আবার একই সঙ্গে দেশটির বহুত্ববাদী সামাজিক ঐতিহ্যকেও আইনগত সংস্কারগুলো আরও বিকশিত করবে।

উল্লিখিত সম্ভাব্য এই তিনটি পরিবর্তনেই তামিলরা লাভবান হবে বলে আশা করা যায়। কারণ রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় তাদের কেউ কখনো রাষ্ট্রপতি হতে পারবে, এমন সম্ভাবনা দুরূহ। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় কিছু আসন পেয়ে তারা সরকার গঠনে কিংবা সরকার পরিচালনায় ভালোভাবেই দর-কষাকষি করতে পারে। আবার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন তাদের দীর্ঘদিনেরই দাবি। ফলে শুরু থেকে দেশটির নতুন সাংবিধানিক পথপরিক্রমায় তামিল দলগুলো ও ভারতের বিশেষ সায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে বর্তমান সংসদকেই সংবিধান সভা হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করলে একপর্যায়ে তা গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সংবিধান বিষয়ে জনগণের কাছ থেকে সুপারিশ এসেছে এবং সেই সুপারিশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে লাল উইজেনায়াকের নেতৃত্বে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৭-এর শুরুতে নতুন সংবিধানের প্রস্তাব তিনি পার্লামেন্টে তুলে ধরতে পারবেন। যদিও সেটা পারেননি তিনি। হয়তো শিগগিরই তা করা হবে। ইতিমধ্যে ৬টি কমিটি সম্ভাব্য সংস্কারের রূপরেখা নিয়ে কাজ শেষ করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমান বিধানমতে নতুন সংবিধান অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং শেষে গণভোটও প্রয়োজন হবে।

সংবিধান প্রণয়ন বা সংস্কারের এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করেই এ মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজের শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের মতামত আহ্বান খুবই গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গির পরিচায়ক হলেও প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতমতো সাংবিধানিক পরিবর্তনের পথে সম্ভাব্য কয়েকটি পাহাড়সম প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে।

প্রথমত, সংবিধানে তামিল স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কিছু সংস্কার সাধনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ে আগ্রহী হলেও তাঁরা দুজনে দুটি ভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। যে দুটি দল আবার ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ফলে তাঁদের দুজনের ব্যক্তিগত মতৈক্য কতটা স্থায়ী হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের দলে (ফ্রিডম পার্টি) ভাঙন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দুজনই সিংহলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মূলধারার সিংহলিদের মতামতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তামিলদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁদের জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এ

বিষয়ে শ্রীলঙ্কায় দায়িত্বপালনকারী ভারতীয় হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতের মতামত এ রকম যে '...there are certain thresholds beyond which no Sinhalese leader can be fully responsive to Tamil aspirations, if he or she desires to survive in power.'[৬]

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট-শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তনে পার্লামেন্ট-শাসিত শাসনে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে দেশটিতে মতামতের পাল্লা ভারী হলেও প্রশাসন ও রাজনীতিতে এমন মতও যথেষ্ট শক্তিশালী যে এতে দেশটির শাসনপদ্ধতিতে আবার দুর্বলতার ছাপ প্রবল হয়ে উঠবে। এরূপ মতামত প্রদানকারীরা দেশের অধিকতর স্থিতিশীলতার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট-শাসিত পদ্ধতির পক্ষে। অন্যদিকে, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা বলছেন, বর্তমানের প্রেসিডেন্ট-শাসিত পদ্ধতি মাঝেমধ্যেই একনায়কতান্ত্রিক রূপ নেয়।

তৃতীয়ত, তামিল অঞ্চলগুলোতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেও সিংহলি সমাজে প্রবল মতদ্বৈধতা রয়েছে। বিশেষত তামিলদের দাবি অনুযায়ী পুলিশ ও ভূমিব্যবস্থার ওপর প্রাদেশিক অধিকারদানের বিরুদ্ধে রয়েছে সিংহলি প্রধান অনেক রাজনৈতিক দল। তবে নতুন সংস্কার প্রস্তাবে এ ক্ষেত্রে পূর্বতন অবস্থার অতিরিক্ত কিছু ছাড় দেওয়া না হলে তামিল সম্প্রদায় যে এরূপ সংবিধান প্রত্যাখ্যান করবে তা নিশ্চিত। অন্যদিকে সিংহলি দলগুলোর প্রবল উপস্থিতির কারণে এ ক্ষেত্রে খুব বেশি ছাড় দেওয়ারও সুযোগ নেই। কারণ, তাহলে গণভোটে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের অন্যতম মনোযোগের বিষয় হবে অবশ্যই এমনতর বিকেন্দ্রীকরণ, যা কেন্দ্রে এবং বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহুত্ববাদী নৃতাত্ত্বিক ধারার সবার মধ্যে ক্ষমতায়নের বোধ তৈরি করে ও সরাসরি প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে তার ছাপ পড়াও জরুরি। অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সম্পূরক হিসেবে প্রয়োজন হবে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ। আরও স্পষ্ট করে বললে সাংবিধানিক ও আইনি সংস্কারকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দৃশ্যগোচর হতে হবে। ফলে শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রেও সংস্কার প্রয়োজন হবে। আবার একটি বহুত্ববাদী সমাজে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়েও সাংবিধানিক নির্দেশনা আবশ্যক। বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সব জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ধারা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সেটা সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। আবার রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ও গণমাধ্যমে দেশটির বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ছাপ কীভাবে প্রতিফলিত হবে এবং একই সঙ্গে কীভাবে তা একক পলিটিক্যাল কমিউনিটির কাঠামো গড়ে তুলবে—এ সবই আসন্ন দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সংস্কার উদ্যোগের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নির্দেশ করবে।

তবে ওপরে উল্লেখিত কাজগুলো যে সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, শ্রীলঙ্কার সংকটের মূলে ইতিহাসের এক বড় ভূমিকা রয়েছে। তামিল ও সিংহলি—উভয় সম্প্রদায় তাদের বাছাই করা কিছু 'ঐতিহাসিক উৎস'কে ব্যবহার করে নিজ নিজ এমন 'পরিচয়' নির্মাণ করেছে, যা প্রতিনিয়ত তাদের বিবাদবাদী জাতীয়তাবাদী মনস্তত্ত্বকে 'বৈধতা' দিয়ে চলেছে। তাদের জাতিগত 'পরিচয়' দাঁড়িয়ে আছে যে ঐতিহাসিক স্মৃতিকথার ওপর, তা প্রতিনিয়ত উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে চলেছে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ, বেদনা ও গর্ব। এই ভাবাবেগ, পরাজয় ও গর্ব জাতিগত 'অপর'-এর সঙ্গে সমন্বয়ের পরিবর্তে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কথাই বলে এবং বিজয় ও পুনর্বিজয়ের তাগিদ দেয়।[৭]

বস্তুত এটা আবার একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এথনো পলিটিকসেরও সমস্যা। এই এথনো পলিটিকসে প্রধান এক ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্ববাছাইকৃত 'ইতিহাস'[৮]। এরূপ ইতিহাস আবার 'মন্ত্র'-এর মতো মর্যাদাশীল। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি জাতির ইতিহাস তাই 'আলাদা' 'আলাদা' এবং তারা পরস্পর নিজেদের 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর কথা বলে, কেবল নিজেদের ইতিহাসকেই 'সত্য' বিবেচনা করে এবং পরস্পরের প্রতি নীরব বৈরিতা ও ঐতিহাসিক হিংসাও লালন করে। এরূপ 'ঐতিহাসিক' উপলব্ধি সর্বশেষ যে কথা সামনে নিয়ে আসে তা হলো, সংখ্যালঘু 'অপর'-এর ওপর সংখ্যাগুরুর (প্রয়োজনীয়) চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের 'স্থিতিশীলতা' (stability) নিশ্চিত হতে পারে।

শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এরূপ 'ইতিহাস চেতনা'র একটি বড় (ও বিপজ্জনক) নজির তার পতাকা নির্মাণের সংস্কৃতিতে দেখতে পাই আমরা। শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে কেউ জানেন, দেশটিতে জনসাধারণের কাছে প্রিয় প্রাণী হলো হাতি। একে সেখানে পবিত্রও গণ্য করা হয়। মন্দিরে মন্দিরে সেখানে হাতি পোষা হয়। এমনকি পারিবারিক পরিসরে হাতিশাবক থাকা সেখানে এলিটদের কাছে মর্যাদার প্রতীকও বটে। কিন্তু এরূপ একটি দেশের জাতীয় পতাকায় যে প্রাণীটির ছবি রয়েছে, তা হলো সিংহ। ১৯৫০-এ তৈরি 'স্বাধীন' শ্রীলঙ্কার পতাকায় সিংহ তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকার এই সিংহের ধারণা তারা নিয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের পূর্বপুরুষ 'বিজয়'-এর মিথ থেকে। বলা হয়, বিজয় যখন (খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৮৬ সালে) শ্রীলঙ্কায় বসতি স্থাপনের জন্য পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাঁর হাতে সিংহ প্রতীক-সংবলিত পতাকা ছিল। আবার সিংহলি এই প্রতীকের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এলটিটিই 'তামিল ইলম' (সম্ভাব্য তামিল রাষ্ট্র)-এর যে পতাকা তৈরি করেছে, সেখানে একগুচ্ছ বুলেটের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে একটি ঝাঁপ দিতে উদ্ধত বাঘের ছবি। কৌতুককর বিষয় হলো, শ্রীলঙ্কায় বাঘ বা

সিংহ কোনোটাই নেই।[৯] সিংহলি শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নতুন রাষ্ট্র কায়েমের সংগ্রামে এলটিটিইও তার পতাকার বাঘ প্রতীক (তামিল ভাষায় যাকে বলা হয় পুলি কোডি; বাংলায় বাঘ পতাকা) নিয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় চোলা রাজাদের সংস্কৃতি থেকে, যে চোলা রাজারা একদা শ্রীলঙ্কার সিংহলি এলাকায়ও রাজত্ব করেছে।

জাতিগত বৈরিতার পাশাপাশি এরূপ যুদ্ধংদেহী 'ইতিহাস'-এর প্রভাব রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাচিন্তায় কীভাবে পড়েছে তার কিছু নজির এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ থেকে। দেশটির সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সুদক্ষ রেজিমেন্টগুলোর নাম রাখা হয়েছে প্রাচীন যুদ্ধ ইতিহাসের সিংহলি রাজাদের নামে (যেমন গামুনু রেজিমেন্ট, গাজাবা রেজিমেন্ট, বিজয়বাহু রেজিমেন্ট ইত্যাদি)। যেসব রাজা লোকপ্রিয় মূলত দক্ষিণ ভারতীয় তামিলভাষীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যে রাজারা যুদ্ধ করেছিলেন উত্তরের তামিল রাজাদের বিপক্ষে। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে শক্তিশালী নৌযুদ্ধজাহাজের একটির নাম হলো পরাক্রম (রাজা পরাক্রমবাহুর নামে)।[১০]

বলা বাহুল্য, এরূপ ইতিহাসচর্চার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্বনির্মিত 'হুমকি' ও 'ভীতি'র ধারণা। শ্রীলঙ্কায় যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিরা সংখ্যালঘু তামিলদের 'হুমকি' এবং 'আগ্রাসী' জ্ঞান করছে এবং তাদের 'ভীতি' থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তামিলদের ওপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে জরুরি মনে করে, তেমনি আমরা দেখব ভারতেও সংখ্যাগুরুদের রাজনৈতিক দর্শন 'হিন্দুত্বভা' সংখ্যালঘু মুসলমানদের 'ঐতিহাসিক প্রতিপক্ষ' সাব্যস্ত করে তাকে 'হুমকি' হিসেবে উপস্থাপন করে। এরূপ কল্পিত 'হুমকি' ও 'ভীতি'র ধারণা, ক্রমাগত ছাপাখানাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদের (Print Capitalism) বিকাশের মধ্য দিয়েই পরিগঠিত করছে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত 'জাতীয় চেতনা' বা 'জাতীয়তা'র ধারণা এবং এই ধারণাকে কাজে লাগানো হচ্ছে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 'পুনর্জাগরণ' ও কথিত 'স্থিতিশীল' রাষ্ট্র নির্মাণে।[১১] আবার আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক তৃতীয় পক্ষ এরূপ 'হুমকি' ও 'ভীতি'র মনস্তত্ত্বে ইন্ধন জুগিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সব সময়ই শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় সরকারকে তামিল ভাষা ও তামিল সংস্কৃতিকে সিংহলি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমানাধিকারের জন্য চাপ দিয়ে গেলেও তাদের দেশে হিন্দির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, কানাড়া ও তেলেগু ভাষা ও সংস্কৃতির তীব্র বিরোধিতার কথা সেখানে ধামাচাপা দেওয়া হয়। 'হিন্দি ও হিন্দুত্বভা' ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদকে প্রতিপক্ষ জ্ঞান করছে। তামিলনাড়ুর রাজনীতি

তথা দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদের মৌলিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে উত্তর ভারতীয় হিন্দি ভাষা ও তার সংস্কৃতিকে বিরোধিতা করতে যেয়ে। তবে শ্রীলঙ্কায় সিংহলিদের বিপরীতে তামিলদের সংগ্রামে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় অবস্থান শর্তহীনভাবে তামিলদের পক্ষে।

বস্তুত এরূপ বিবিধ সংকট ও স্ববিরোধিতা ধামাচাপা দিয়েই দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ 'জাতিরাষ্ট্র' গঠনের চেষ্টা করেছে ও করছে। কিন্তু বিবদমান জাতিসত্তাগুলো যতক্ষণ 'ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা'র শক্তির ওপর নির্ভরতা বাদ দিয়ে একক পলিটিক্যাল 'কমিউনিটি' আকারে নিজেদের পুনর্গঠন না করছে, তত দিন এথনো পলিটিকসের চলতি সংকটের স্থায়ী সমাধান প্রায় অসম্ভব। এটা তাই কেবল পশ্চিমা 'আধুনিকতা'র আলোকে কিছু সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমেই ফয়সালাযোগ্য বিষয় নয়। যদিও পশ্চিমের ওই 'আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা'ই ওপরে আলোচিত 'ইতিহাস'রূপী 'মন্ত্র'-এর শক্তিশালী সামাজিক ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে উপনিবেশ-উত্তর দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রকাঠামোতে বহু জাতিসত্তার সমন্বয়ে সেক্যুলার 'জাতিরাষ্ট্র' নির্মাণের চ্যালেঞ্জ রেখে গেছে। শ্রীলঙ্কাও তার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

চতুর্থত, নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে সংবিধানকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক করার ইঙ্গিত দেওয়ামাত্র সমাজে প্রগতিশীল অনেক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। যেমন অতীতে তামিল ও সিংহলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি প্রবল দাবি ছিল কুখ্যাত 'প্রিভেনশন অব টেররিজম অ্যাক্টের (পিটিএ)' মতো বিতর্কিত আইনগুলো বাতিল বা এগুলোর সংস্কার সাধন করা। এমনকি ২০১৫ সালের ১ অক্টোবর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শ্রীলঙ্কাকে এই মর্মে হুঁশিয়ারও করেছিল যে পিটিএর সংস্কার সাধিত না হলে তারা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতেও আইনি সংস্কার সাধন সহজ হবে বলে মনে হয় না। দীর্ঘ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশটিতে সামরিক আমলাতন্ত্রের যে অধিকতর সবল উপস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং সিংহলি জাতীয়তাবাদ যে বিজয়মূলক কর্তৃত্বশালী অবস্থায় রয়েছে, তাকে অবদমিত করে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলধারার বাইরের ভিন্নমত-ভিন্ন সংস্কৃতি-ভিন্ন মূল্যবোধের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তৈরি বেশ দুরূহ। ফলে নতুন সংবিধানকে ঘিরে গণতান্ত্রিক মহলের চলতি উচ্চ-আশাবাদ ব্যাপক হতাশাও তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যে সংস্কার প্রস্তাব আকারে যে অধিকারমালা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বলে জানা গেছে, তার মধ্যে জীবনের অধিকার, সব লিঙ্গ ও ধর্মের সমানাধিকার ইত্যাদিও রয়েছে। কিন্তু পিটিএর কোনো নমনীয় সংস্করণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না, বরং গণমাধ্যমে ফাঁস হওয়া 'কাউন্টার

টেররিজম অ্যাক্ট' আকারে যে নতুন আইনের খসড়া দেখা গেছে, তাকে নিয়ে সমাজে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।[১২]

পঞ্চমত, সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবে ভোটপদ্ধতি পরিবর্তনেরও চেষ্টা চলছে। বর্তমানে দেশটিতে রাজনৈতিক দলগুলো জেলাভিত্তিক প্রাপ্ত ভোটের হিস্যা অনুযায়ী আসন পেয়ে থাকে। তবে নতুন পদ্ধতিকে সিংহলি, তামিল ও মুসলমান সমাজ দেখবে নিজ নিজ প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির আলোকে। কেউই তাদের প্রতিনিধিত্ব কমবে—এমন কোনো সংস্কারের প্রস্তাব মেনে নেবে না, সেটা যত উত্তমই হোক।

ষষ্ঠত, শ্রীলঙ্কার নতুন সাংবিধানিক পথপরিক্রমায় নেপালের অভিজ্ঞতাও ভীতি ছড়াচ্ছে। নেপাল আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক একটি সংবিধান তৈরি করেও ২০১৫-১৬ সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারেনি বড় প্রতিবেশীর সমর্থনপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লাগাতার আন্দোলনের কারণে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা শ্রীলঙ্কার সামনেও অনুরূপ বিপদ আঁচ করছেন যদি না সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কার ভারতের মনঃপূত হয়। সে ক্ষেত্রে সিংহলি-তামিল-মুসলমান তিক্ততা আবারও তীব্রতাই পাবে কেবল। বস্তুত শ্রীলঙ্কার নাগরিকেরা এবং দক্ষিণ এশিয়ার আগ্রহী সবাই দেশটির নতুন সংবিধানে অন্য সব সংস্কার প্রস্তাবের চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করবে জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে কী সমাধান আসছে, সেদিকে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা হবে, সংস্কার করা সংবিধান 'Sri Lankan Identity'-কে সব নাগরিকের মধ্যে বিস্তৃতি দিতে সক্ষম হচ্ছে, নাকি এখনকার বিবদমান 'Ethnic Identity'-কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। দুটোই কঠিন।

এখনো পারস্পরিক ক্রুদ্ধ অবিশ্বাস

শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ও তামিলদের অটল মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান দেখে ১৯৯৮ সালে যুদ্ধরত একজন ব্রিগেডিয়ার হাস্যচ্ছলে বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কায় জাতিগত বিবাদ নিরসনের একটিই পথ—তামিল ও সিংহলিদের মধ্যে বেশি বেশি বিয়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্যত এটাও যে কোনো সমাধান নয়, সেটাই প্রমাণিত হয় দেশটির তামিলপ্রধান নর্দান প্রভিন্সের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সি ভি উইগেনেশরণকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে। এই লেখা তৈরির সময় (২০১৬ সালে) লক্ষ করা গেছে, সাবেক এই তামিল বিচারপতি প্রায় প্রতিদিনই সিংহলিদের প্রতি সমালোচনামূলক কিছু না কিছু বলে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় থাকছেন। কিন্তু উইগেনেশরণের দুই পুত্রই প্রভাবশালী সিংহলি রাজনৈতিক পরিবারের নারীদের বিয়ে করেছেন। ফলে তাঁর সিংহলি বিদ্বেষকে স্রেফ রাজনৈতিক কৌশল বলে অগ্রাহ্য করা গেলেও শ্রীলঙ্কার

নেতৃস্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি অল্টারনেটিভস'-এর এক জরিপে,[১৩] জাতিগত ব্যবধান দূর করা-সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে দেখা গেছে, ৩৫ ভাগ (সিংহলি) মনে করছেন তামিলদের জন্য সরকার যথেষ্ট কিছু করেছে। মাত্র ৩ ভাগ (সিংহলি) বিপরীত মত দিয়েছে। অন্যদিকে ৪০ শতাংশ (তামিল) মনে করেছে সরকার কিছুই করেনি, আর ২ শতাংশ মনে করছে অনেক কিছু করেছে। বাকিরা কোনো মত দেয়নি।

অন্যদিকে একই সংস্থার অপর এক জরিপে দেখা গেছে,[১৪] জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মনে করে, যুদ্ধকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আর কোনো তদন্তের প্রয়োজন নেই। আবার যাঁরা বলছেন ওইরূপ বিষয়ে তদন্ত ও বিচার প্রয়োজন—তাদের মধ্যেও ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে—বিচার আন্তর্জাতিক কাঠামোতে হবে, নাকি অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে হবে, সে বিষয়ে।

সিংহলি-তামিল মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের আরেকটি স্মারক দেখা যায় নর্দান প্রভিন্সজুড়ে ব্যাপক সামরিক উপস্থিতির মধ্য দিয়েও। সেখানে তামিলদের বর্তমান অসন্তোষের অন্যতম একটি কারণ হলো তামিল মালিকানাধীন জমিগুলোতে অনেক সেনাচৌকির অবস্থান। কিন্তু সিংহলি শাসক এলিটদের পক্ষেও সেখান থেকে সামরিক উপস্থিতি প্রত্যাহার বা কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে কমই—কারণ, রাষ্ট্রকে তামিলরা তদ্রূপ আত্মবিশ্বাসী দিতে পারেনি। উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিতে এমন উপাদান বিরল নয়, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সামরিক বাহিনী সরে গেলে সেখানে আবার সশস্ত্রতা গড়ে উঠতে পারে। সিংহলি ও তামিলরা যে পরস্পরকে আস্থায় নিতে পারেনি, এটা তারই স্মারক।

এরূপ বৈরিতা কেবল উত্তর বা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে সীমাবদ্ধ নেই। এমনকি তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও বিস্তৃত। যেমন এই লেখা যখন তৈরি হচ্ছিল তখন, ২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম সাহিব আনসারকে সে দেশে থাকা তামিলরা দল বেঁধে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে 'নিরাপত্তা চৌহদ্দি'র মধ্যে মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। আক্রমণকারী এই তামিলরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিল, 'আমরা তামিল' (NaamThamizhar) নামে একটি দলের সদস্য হিসেবে এবং তাদের শরীরে এলটিটিইর প্রয়াত নেতা প্রভাকরণের ছবি শোভা পাচ্ছিল। রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম সাহিব সেদিন তাঁর দেশের একজন মন্ত্রীর আগমন ও অপর দুই মন্ত্রীর দেশে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে বিমানবন্দরে প্রটোকল অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছিলেন। মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘটনার অধিকতর তদন্তকালে দেখা যায়, আক্রমণকারীরা মূলত সাবেক প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষেকে খুঁজছিল এবং তারা তামিল হলেও দেশটিতে

ভারতীয় পাসপোর্টধারী এবং তাদের নেতা হলেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা ও পরিচালক সিমান (Seeman)।

বলা বাহুল্য, এ ঘটনা শ্রীলঙ্কাজুড়ে বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে এবং সবার মধ্যেই এই মর্মে উদ্বেগ তৈরি করেছে যে এ ঘটনায় আক্রমণকারীরা যদি সাবেক রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষেকে আক্রমণ করতে সক্ষম হতো, তাহলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশে বড় আকারে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়ে যেতে পারত।

এদিকে মালয়েশিয়ার এ ঘটনার পরপরই দেশটির নর্দান প্রভিন্সের মুখ্যমন্ত্রী সি ভি উইগেনেশরণের একটি রাজনৈতিক উদ্যোগও এলটিটিই-বিরোধী ও একই সঙ্গে বর্তমান সরকারবিরোধী বদু বালা সেনাসহ (বিবিএস) সিংহলি প্রাধান্যপূর্ণ অনেক দলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তামিলপ্রধান প্রদেশের তামিল মুখ্যমন্ত্রী উইগেনেশরণ তামিলদের আবার উঠে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর একটি গণমিছিলের আয়োজন করেন। তামিল ভাষায় তিনি একে অভিহিত করেছেন 'Eluga Tamil' (Rise Tamil) মিছিল নামে এবং এই মিছিল থেকে তামিলপ্রাধান্যপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারণ ও নর্দান প্রভিন্স থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

সি ভি উইগেনেশরণ তামিল জোট টিএনএ থেকে প্রদেশটিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও 'Eluga Tamil' উদ্যোগ নেওয়া হয় তাঁর নেতৃত্বে গঠিত তামিল পিপলস কাউন্সিল (টিপিসি) নামের একটি ব্যানার থেকে এবং এ আয়োজনকে এলটিটিই সহানুভূতিশীলদের একটি অহিংস মহড়া হিসেবেও দেখা হচ্ছে। তাঁর এই উদ্যোগের সমালোচনা করে সিংহলি রাজনীতিবিদদের একাংশ বলছে, যে মুহূর্তে জাতিগত বিভেদ অতিক্রম করে সব সম্প্রদায়ের সম্মিলিতভাবে উঠে দাঁড়ানো উচিত, সে মুহূর্তে তামিল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শুধু তামিলদের উঠে দাঁড়াতে বলা ২০০৯-পূর্ব সময়কে ডেকে আনা। এরূপ সমালোচকেরা মালয়েশিয়া অধ্যায়ের সঙ্গে সি ভি উইগেনেশরণের রাজনৈতিক উদ্যোগকে একই সূত্রে প্রোথিত দেখাতে ইচ্ছুক এবং তাঁদের মতে Eluga Tamil শোভাযাত্রা দেশটির আন্তসাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতরতাকে নতুন করে জ্বালানি দিয়েছে।

যথারীতি কয়েক দিন পরই নর্দান প্রভিন্সেরই ভাবুনিয়াতে Eluga Tamil শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে সমাবেশ ও মিছিল করেছে 'বধু বালা সেনা' (Bodu Bala Sena/Buddhist Power Force) নামের ডানপন্থী প্রভাবশালী ধর্মপ্রভাবিত দলটি। এমনকি দেশটির নর্দান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল থেকে এমন দাবিও করা হয়েছে যে Eluga Tamil শোভাযাত্রা করার পর থেকে উইগেনেশরণকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।[১৫]

আপাতদৃষ্টিতে এসব সমাবেশ ও পাল্টাসমাবেশকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা আসন্ন নতুন সংবিধানকে ঘিরে জাতিগত দর-কষাকষির মহড়া হিসেবে বিবেচনা করলেও এ-ও সত্য, এরূপ ধারাবাহিকতা নিকট ভবিষ্যতে আরও তীব্রই হবে। কারণ, সিংহলি ও তামিল চরমপন্থী কোনো পক্ষই চাইছে না সংবিধানে জাতিগত বিভেদের এমন কোনো মধ্যপন্থী সমঝোতামূলক সমাধান আসুক, যা তাদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবহীন করে ফেলে।

Eluga Tamil (Rise Tamil) মিছিলকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তামিল আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক বিতর্ক হচ্ছে। এরূপ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিচ্ছে কি না, সে প্রশ্ন উঠেছে। উদ্যোক্তারা এরূপ আয়োজনের পেছনে তামিলদের 'ন্যায্য দাবিদাওয়া' উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও সেখানে উত্তরাঞ্চল থেকে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি অপসারণের দাবি বেশ জোরালোভাবেই উচ্চারিত হয়। স্বভাবত তামিলদের তরফ থেকে এরূপ স্পর্শকাতর দাবি ওঠায় দেশটির দক্ষিণে যেসব প্রগতিশীল সিংহলি নাগরিক তামিলদের সঙ্গে সমঝোতার লক্ষ্যে জনমত গঠনে সক্রিয়, তাদের কাজের পরিসর অনেক কমে গেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা এই বার্তাও দিচ্ছে যে তামিল পরিমণ্ডল এলটিটিইর অতীত রাজনৈতিক ও সামরিক নীতিকৌশলের কোনো আত্মসমালোচনা বা পর্যালোচনার লক্ষণ নেই এবং তারা বঞ্চনাভিত্তিক ইতিহাস-কাঠামো থেকে বেরিয়ে গঠনমূলক এমন কোনো অবস্থান নিতে সক্ষম হচ্ছে না, যাতে সিংহলি সমাজে তাদের ঘিরে সন্ত্রাসের ভয় লাঘব হয়। এ ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী একজন তামিল মোহন সেগারাম (Mohan Segaram)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য বিশেষ মনোযোগ দাবি করে :

> We cannot forget what happened for the past three decades, however we need to put aside our emotions, despair and remember those lives, which were lost in bloody war in the name of 'equality'. We (Tamils) have to now reconcile and win the trust of the nation…We are hanging on to views and ideologies, which formed thirty years ago, which are not appropriate anymore. I think that, in the past 20 years we have created a doubt in the minds of the Sinhalese and the nation, making them wonder whether every other Tamil is a Tamil Tiger or not.[১৬]

মোহন সেগারামের উল্লিখিত প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা অনেক। যদিও তামিলদের বর্তমানের প্রধান রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম টিএনএও উল্লিখিত Eluga Tamil (Rise Tamil) মিছিলের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে

কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে, বিশেষত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এলটিটিইর যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সক্রিয়, তারা বিভেদের ইতিহাসকে বাজারজাত করা বন্ধ করবে, এমন ভাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাদের দক্ষতাপূর্ণ প্রচারযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকটের জন্য সিংহলিদেরই একতরফাভাবে দায়ী করা হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেশটিতে জাতিরাষ্ট্রের চেতনা প্রতিনিয়ত অবজ্ঞাত হয়।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণ ও আসন্ন 'স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ'

বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট সিরিসেনার মেয়াদের তৃতীয় বছর এবং প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহের মেয়াদের দ্বিতীয় বছর চলছে। অর্থাৎ সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে ২০১৫ সালের ৮ জানুয়ারি এবং পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে ২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে এবং পার্লামেন্ট নির্বাচন শেষে দেশটির অভূতপূর্ব দুটি ঘটনা ঘটেছে, যা শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সুদূরপ্রসারী কিছু জটিলতার জন্ম দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির রাজাপক্ষে হেরেছিলেন তাঁর দলেরই অপর প্রার্থী সিরিসেনার কাছে। সিরিসেনাকে সমর্থন দিয়েছিল ফ্রিডম পার্টিরই চিরশত্রু ন্যাশনাল পার্টি। আবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে ন্যাশনাল পার্টি ২২৫ আসনের সংসদে ১০৬ আসন পেয়েও সরকার গঠন করতে পেরেছিল ফ্রিডম পার্টির একাংশের সমর্থনে, যে একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিরিসেনা। ফ্রিডম পার্টি পার্লামেন্ট নির্বাচনে ৯৫টি আসন পেয়েছিল।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় নতুন যে অদ্ভুত অবস্থা তৈরি হয়েছে তা হলো দেশটির পার্লামেন্টে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই। যেহেতু দেশটির প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রধান দুটি দলের পরিচয়ধারী এবং তাঁরা মতৈক্যের ভিত্তিতে দেশের নীতিনির্ধারণ করছেন এবং পরস্পরকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন তাতে দেশে, বিশেষ করে পার্লামেন্টে বিরোধী দল না থাকাই স্বাভাবিক। তবে এর মধ্যেই পার্লামেন্টের কিছু সদস্য মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী গ্রুপ' নামে একটি জোট গড়ে তুলেছেন। এই জোটে রয়েছেন ফ্রিডম পার্টির (রাজাপক্ষে সমর্থক) একাংশের এমপিরা এবং জেভিপি (জনতা বিমুক্তি পেরামুনা) ও অন্যান্য ছোট ছোট কয়েকটি দলের এমপিরা।[১৭]

আলোচ্য 'সম্মিলিত বিরোধী গ্রুপ' নামের জোটটি গড়ে উঠেছে মূলত ফ্রিডম পার্টির অভ্যন্তরে সিরিসেনা ও রাজাপক্ষের বিভেদের পটভূমিতে। এই বিভেদ ক্রমে বাড়ছে এবং রাজাপক্ষের অনুসারীরা ক্রমে ফ্রিডম পার্টি থেকে নিজেদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা আকারে হাজির করছেন। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পূর্ণতা পেতে

আরও কিছু সময় লাগলেও দ্রুত তা শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দীর্ঘ ছায়া তৈরি করছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ফ্রিডম পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি ও সংগঠক রাজাপক্ষের পক্ষেই রয়েছেন।

ফ্রিডম পার্টির এরূপ বিভক্তি দেশটির রাজনীতির বিদ্যমান ভারসাম্য ও সমীকরণ পুরোই পাল্টে দেবে। কিন্তু তার স্পষ্ট রূপটি এখনো বোঝা না গেলেও এর সরাসরি একটি প্রতিক্রিয়া হবে গণভোটকালে। নতুন সংবিধানকে চূড়ান্তভাবে কার্যকর হতে হলে গণভোটে তা অনুমোদিত হতে হবে। আর গণভোটকালে রাজাপক্ষে যদি সিরিসেনা-বিক্রমাসিংহে সমর্থিত রাজনৈতিক-সাংবিধানিক সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, যা প্রায় নিশ্চিত, তাহলে দেশটিতে বহুল প্রত্যাশিত 'জাতীয় মতৈক্য' সুদূরপরাহতই থেকে যাবে এবং 'সাংবিধানিক এক ঠান্ডাযুদ্ধ'-এর জন্ম হবে।[১৮] আবার গণভোটে তাদের প্রত্যাশিত ফল না আসার সম্ভাবনা দেখলেই তামিল রাজনৈতিক দলগুলো কোনো না কোনো অজুহাতে গণভোট বয়কট করবে। এটাও জাতীয় মতৈক্যের সম্ভাবনা বিঘ্নিত করবে।

এদিকে ২০০৯-এর পর থেকে দেশটির রাজনীতিতে তামিল সশস্ত্র সংগঠনগুলোর অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতা পূরণে রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে এসেছে তামিল ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (টিএনএ) নামের জোট। এই জোট গড়ে উঠেছে সাবেক সশস্ত্র গ্রুপগুলোর নেতা ও মধ্যপন্থী তামিল রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে। এরাই বর্তমানে তামিলদের পক্ষে মূল রাজনৈতিক দর-কষাকষি করে থাকে। ২০১৫ সালের নির্বাচনে এই জোট ১৬টি আসন পেয়ে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। তবে সরকার পরিচালনায় তারা আবার বর্তমান ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক মিত্র।

টিএনএ তামিলদের জন্য পৃথক আবাসভূমির পরিবর্তনে উত্তর ও পূর্বের প্রদেশ সমন্বয় করে সেই একীভূত প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন পেলেই সন্তুষ্ট হবে বলে জানিয়েছে। তবে এখনো তারা এলটিটিইকেই তামিলদের মূল প্রতিনিধি মনে করে। ধারণা করা যায়, টিএনএ সিরিসেনা ও বিক্রমাসিংহে সমর্থিত সাংবিধানিক-রাজনৈতিক সংস্কারের সমর্থকের ভূমিকায় থাকবে। তবে তামিলদের একাংশের মধ্যে টিএনএকে নিয়েও হতাশা রয়েছে। কারণ, নর্দান প্রভিন্সে এখন ক্ষমতায় রয়েছে তারা। কারণ নর্দান প্রভিন্সে টিএনএ ক্ষমতায় থাকলেও সেখানে তামিল সমাজের জন্য তারা প্রশাসনিকভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। আবার যুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তার সুযোগে টিএনএ তথা এলটিটিইবিরোধী তামিল সংগঠনগুলোও মাঠে কাজ করছে। ফলে ভবিষ্যতে টিএনএর প্রতিই তামিলদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন বহাল থাকবে কি না, সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ।

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয়তাবাদী সিংহলিদের মোকাবিলায় ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে টিএনএ তার রাজনৈতিক কৌশল পরিচালনা করে থাকে। যেমন ২০১০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা সাবেক সেনাপ্রধান শরথ ফনসেকাকে সমর্থন দিয়েছিল। এই শরথ ফনসেকাই এলটিটিইকে পরাজিত করার চূড়ান্ত যুদ্ধে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার ২০১৫ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে সিরিসেনার দলকে সমর্থন জানায় তারা। অন্যদিকে ফনসেকাও এখন সিরিসেনাকে সমর্থন করছেন এবং একই সঙ্গে ন্যাশনাল পার্টির বিক্রমাসিংহের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন।

রাজনৈতিক সমর্থনের সতত পরিবর্তনশীল এরূপ ধারা শ্রীলঙ্কায় পুরোনো ঐতিহ্য। এরূপ ঐতিহ্যের মধ্যেই শিগগিরই ঘোষিত হবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহ এবং একে ঘিরে পরিস্থিতি কিরূপ উত্তপ্ত হবে তার আলামত ইতিমধ্যে দৃশ্যমান। বিশেষ করে দেশটির ধর্মীয় পরিচয়, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলকে দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের ধরন, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বিপরীতে ফেডারেল ব্যবস্থা, বিচার বিভাগকে কতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার ক্ষমতা বিচার বিভাগের থাকবে কি না, প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টের হাতে কতটুকু নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে ইত্যাদি নিয়ে এই লেখা চলাকালেই দেশটিতে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে নর্দান ও ইস্টার্ন প্রভিন্স একত্র করে একটি একক (তামিল) প্রভিন্স সৃষ্টি অন্যতম বিবাদিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম সমর্থক চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা দেশটিতে ফেডারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সম্প্রতি।[১৯] যদিও অতীতে দেশটির ক্ষমতাসীন সব সরকারই ফেডারেল ব্যবস্থার দাবি অগ্রাহ্য করেছে। সিংহলি দক্ষিণে এরূপ মনোভাব প্রবল যে ফেডারেল ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে একক তামিল প্রদেশ তৈরি মানেই তাতে পার্শ্ববর্তী তামিলনাড়ুর প্রভাবকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেওয়া এবং কলম্বোকেন্দ্রিক দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরোক্ষ বিচ্ছিন্নতা তৈরি। অথচ এই দাবিটি তামিলদের অন্যতম প্রধান দাবি। ফলে এই সমস্যার যে সমাধানই সংবিধানে প্রস্তাব করা হোক, তা গণভোটে আসামাত্রই তীব্র রাজনৈতিক ভিন্নমত দেখা দেবে। বিশ্লেষকেরা যাকে বলছেন 'শ্রীলঙ্কার স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ'।[২০]

যুদ্ধাপরাধের বিচার ও যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

সংবিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মতোই যুদ্ধোত্তর শ্রীলঙ্কার অন্যতম বিবাদিত বিষয় যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্ন। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারকেরা যখনই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন, তখনই এ বিষয়ে

প্রশ্ন ওঠে। সচরাচর তারা এ বিষয়ে উক্তরূপ অপরাধ ঘটার কথা স্বীকার করেন। উপরন্তু দেশটিতে যুদ্ধজয়ী সেনাবাহিনীকে বীর হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু তামিল সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে নির্মূলের সফলতায় সেই সময়কার সেনাপ্রধান ফনসেকা দেশটির দক্ষিণের সিংহলি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে এখন নায়ক হিসেবে বিবেচিত হলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেকেরই তাঁর কার্যকালে সেনাবাহিনী যুদ্ধাপরাধ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বলাবাহুল্য, যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজে সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধের দায় রাষ্ট্র ও সরকারের ওপরও বর্তায়। চূড়ান্ত যুদ্ধকালে শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতায় ছিলেন রাজাপক্ষে। ক্ষমতায় থাকাকালে রাজাপক্ষে চীনপন্থী পদক্ষেপ নিতে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নিয়েছিল। ফলে দেশটির এখনকার রাজাপক্ষেবিরোধী নেতৃত্বের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের স্বার্থরক্ষার বিশেষ চাপ রয়েছে। পাশাপাশি রাজাপক্ষেকে চাপে রাখতে এলটিটিই নির্মূলাভিযানের সময় শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী যুদ্ধাপরাধ করেছে বলে প্রবাসী তামিলরা যে প্রচারণা গড়ে তুলেছে, তা-ও চলমান রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও সিংহলি জাতীয়তাবাদীদের চাপে রাখার কৌশল নেওয়া হয়েছে এবং তা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধের পরপর দীর্ঘ সময় তামিলনাড়ুতে এই দাবি খুবই জোরদার ছিল যে ভারতের উচিত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা, যাতে দেশটি ২০০৯ সালের যুদ্ধাপরাধের তদন্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কলম্বোতে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকার ক্ষমতায় আসামাত্র এই দাবি এখন আর শোনা যায় না। তবে ইতিমধ্যে ভারত জাতিসংঘের ১৯তম অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে, যাতে দেশটিকে যুদ্ধকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ক্ষেত্রে খুবই উৎসাহী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের থিংকট্যাংক 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ' তামিল-প্রশ্নে আন্তর্জাতিকভাবে খুবই সক্রিয় এখন। তারা বিশেষভাবে তামিল-অধ্যুষিত এলাকায় শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে।[২১] যা কার্যত এলটিটিইকে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে। আন্তর্জাতিক মহল যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে কেবল শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও এলটিটিইও যে মুসলমান ও সিংহলি বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, সে বিষয় উল্লেখ করছে কমই। তবে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে এখনো বাস্তব অগ্রগতি কম। যুদ্ধকালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে শ্রীলঙ্কা সরকার একটা কমিশন গঠন করলেও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ তদন্তে তারা নিজস্ব উদ্যোগের ওপরই শুধু জোর দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান এক সমস্যা হলো, দেশটির জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও তারা এরূপ তদন্ত ও তার

প্রতিকারের জন্য কাঠামোগতভাবে সামর্থ্যবান সংস্থা নয়। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও বিচারের জন্য প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতির শিকার উভয়ের জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তার প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক মতৈক্য ছাড়া সম্ভব নয়। আবার এরূপ তদন্ত ও বিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকার প্রয়োজন, যা নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকার ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু চরমভাবে দ্বিধাবিভক্ত শাসক এলিটদের মধ্যে এরূপ আন্তরিক অঙ্গীকার রয়েছে বলে এখনো মনে হয় না।

একইরূপ অঙ্গীকারের প্রশ্ন আসে যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নেও। শ্রীলঙ্কার যুদ্ধ হয়েছে প্রায় তিন দশক ধরে। ফলে বহু দফায় এখানে মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। যদিও চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু সমস্যার ঢেউ বয়ে যায়। এরূপ উদ্বাস্তুদেরই ভাবুনিয়া জেলার বিভিন্ন স্কুলে ক্যাম্প করে রাখা হয়। সে সময় এসব ক্যাম্পের নাম দেওয়া হয় 'welfare centres' এবং সরকারিভাবে প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার এরূপ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর কথা বলা হলেও এক বছরের মধ্যে দাবি করা হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বাস্তুকে 'পুনর্বাসন' করা হয়েছে এবং ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্ধ' ঘোষণাও করা হয়। তবে সরকারি-বেসরকারি সবাই স্বীকার করেন, ক্যাম্প বন্ধ হলেও সমস্যাটি রয়েই গেছে দেশটিতে।[২২]

অন্যদিকে অতীতে ও বর্তমানেও উদ্বাস্তু-সংকট এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর প্রকৃত সংখ্যা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত কোনো ম্যাপিং নেই। এই গ্রন্থ রচনার সময়ও বিভিন্ন সূত্রে দেশটিতে প্রায় ৪০ হাজার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু রয়েছে বলে জানা যায়।[২৩] ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার। নর্দান, ইস্টার্ন ও নর্থ-ইস্টার্ন প্রভিন্সেই অধিকাংশ উদ্বাস্তুর বাস।

রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ ছাড়াও ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামির ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা অধিকতর জটিল হয়েছে। আবার উদ্বাস্তুদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধকালীন 'নতুন উদ্বাস্তু' এবং ১৯৮৩ থেকে সৃষ্ট 'পুরোনো উদ্বাস্তু' থাকলেও প্রথমোক্ত উদ্বাস্তুদের সমস্যাই সাধারণভাবে আলোচনায় আসছে। ফলে চূড়ান্ত যুদ্ধের বহু আগে এলটিটিই দ্বারা নর্দান প্রভিন্স থেকে উৎখাত হওয়া অ-পুনর্বাসিত অন্তত ৬০ হাজার মুসলমান উদ্বাস্তুর কথা কমই এখন আলোচনায় আসে।

সরকার ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে বলে দাবি করলেও সেই 'পুনর্বাসন' কতটা টেকসইভাবে হচ্ছে বা হয়েছে, তা নিয়ে তামিলদের মধ্যে বিবিধ অসন্তোষ রয়েছে এবং দেশের বাইরে, বিশেষ করে ভারতেও এরূপ প্রায় ৬৫ হাজার উদ্বাস্তু রয়েছে পুনর্বাসনের অপেক্ষায়, যাদের

ফেরত আনার বিষয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের জন্য সহজ নয়। কারণ তাদের মধ্যে কে এলটিটিইর সদস্য আর কে নয়, সেটা শনাক্ত করা দুরূহ। ভারত নিজেও যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্বাসনের নামে শ্রীলঙ্কার মাটিতে উপস্থিত রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত তামিলদের জন্য ৫০ হাজার বাড়ি তৈরির এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

যদিও দেশটির সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের তরফ থেকে সব নাগরিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সনদেও শ্রীলঙ্কা স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কিন্তু যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রকৃতই দেশটিতে বড় এক চ্যালেঞ্জ। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী যেসব উদ্বাস্তুকে 'পুনর্বাসিত' বলা হচ্ছে, কার্যত তাদের অনেকে 'মূল বাসস্থানে ফেরত' যেতে পারেনি। কেউ কেউ তাদের গ্রামেও যেতে পারেনি। হয়তো কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছে ফিরে গেছে। আবার কেউ কেউ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে পারলেও হয়তো বাসস্থান বিধ্বস্ত হয়ে আছে কিংবা কৃষিজমি ফিরে পায়নি বা পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার উপায় নেই—এরূপ সমস্যা রয়েই গেছে। অনেক এলাকায় নিরাপত্তাহীনতার সংকট রয়ে যাওয়ায় 'ফেরত যাওয়া' মানুষেরা দিনে এক জায়গা এবং রাতে ভিন্ন জায়গায় থাকে। আবার অনেক স্থানেই আবাদি জমিগুলো মাইন কিংবা অবিস্ফোরিত অস্ত্রে ভরে আছে। কোথাও কোথাও এলাকাগুলো এখনো সামরিক বাহিনীর 'হাইসিকিউরিটি জোন' অভিধা দিয়ে অপ্রবেশযোগ্য ঘোষণা করে রাখা হয়েছে। আবার এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে 'হাইসিকিউরিটি জোন'গুলো একপর্যায়ে 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে' 'স্পেশাল ইকোনমিক জোন' ঘোষণা করা হচ্ছে। ইস্টার্ন প্রভিন্সের ত্রিংকোমালির শ্যামপুরে এরূপ ঘটেছে। তাতে এক স্থানেই প্রায় ছয় হাজার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন বিঘ্নিত হয় এবং পুরোনো মালিকদের পুরোনো পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৪]

অন্যদিকে অনেক উদ্বাস্তুই ভোটাধিকার-বঞ্চিত। কারণ ভোট দিতে হলে নিজ জেলায় ভোটার হিসেবে নথিভুক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে 'পুনর্বাসন', 'ফিরে যাওয়া', 'নিরাপদ বাসস্থানে ফিরে যাওয়া', 'নিজ জেলায় ফিরতে পারা', 'জীবন-জীবিকা ফিরে পাওয়া' ইত্যাদির মধ্যে বেশ ফারাক রয়েছে। যদিও সরকারি নীতিনির্ধারকেরা ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ফারাকটুকু উহ্য রেখেই প্রায়ই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি করে যাচ্ছেন। আবার মানবিক ক্ষতি ছাড়াও যুদ্ধ অনেকেরই আয়-রোজগারের সবটুকু কেড়ে নিয়েছে। এরূপ মানুষদের 'ক্ষতি' কীভাবে 'পূরিত' হবে, সেটাই বস্তুত যুদ্ধের পর থেকে শ্রীলঙ্কার জন্য প্রধান মনোযোগের বিষয়। এরূপ ক্ষতিপূরণ আবার তখনই কেবল টেকসই হতে পারে যখন যুদ্ধোত্তর শান্তি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি টেকসই কোন পাটাতন পাবে। কার্যত সে ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা এখনো পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, জাতিবিদ্বেষ-সংক্রান্ত রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যার মতোই তা থেকে উদ্ভূত উদ্বাস্তু-সংকটও শ্রীলঙ্কা সাত বছর পরও চূড়ান্তভাবে সমাধান করতে পারেনি।[২৫] অনেক উদ্বাস্তু রয়েছে বিধবা, অনেক রয়েছে পিতা-মাতাহীন শিশু। আবার এমন নারীও রয়েছেন যাঁরা এখনো তাঁদের নিখোঁজ স্বামীদের খুঁজছেন এবং অনেক শিশু রয়েছে, যারা এলটিটিইর যোদ্ধা হিসেবে রিক্রুট হয়েছিল। এরূপ উদ্বাস্তু নারী, বিধবা[২৬] ও পিতা-মাতাহীন শিশু এবং শিশু যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে বিবিধ মানবিক সহায়তার প্রশ্নও জড়িত। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিল যে তারা অন্তত ১,০৩৬ পিতা-মাতাহীন শিশুকে মান্নার ও ভাবুনিয়ার এতিমখানাগুলোয় পাঠিয়ে দিয়েছে।[২৭] বলা বাহুল্য, এরূপ শিশুদের শুধু এতিমাখানায় পাঠানোই 'পুনর্বাসন' শর্ত পূরণ করে না, বরং তাদের প্রয়োজন দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা। অন্যদিকে যেসব যুদ্ধবিধবা স্বামীদের ডেথ সার্টিফিকেট দেখাতে পারছেন তাঁদের ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তার ঘোষণা এলেও এরূপ ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করা অনেকের পক্ষেই সহজ নয় (এরূপ বিধবাদের মাসে ১৫০ রুপি করে সহায়তা দেওয়া হয়) এবং যাঁরা মনে করছেন তাঁদের নিখোঁজ স্বামীকে ফিরে পাবেন, তাঁদের জন্য এরূপ সহায়তার জন্য চেষ্টা করাই মানসিকভাবে অসম্ভব।

আবার যুদ্ধ শেষে প্রায় ১২ হাজার এলটিটিই যোদ্ধা প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর হাতে আটক হয় বলে দাবি করা হয়েছে। এদের পুনর্বাসনও সরকারের জন্য এক চ্যালেঞ্জ এবং নিশ্চিতভাবেই পুনর্বাসন উদ্যোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ। কীভাবে এরূপ সাবেক যোদ্ধাদের 'পুনর্বাসন' করা হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এমনও অভিযোগ ছিল যে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্প থেকে এরূপ যোদ্ধাদের অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে।[২৮] আবার বাকি সাবেক যোদ্ধাদের 'পুনর্বাসন' এই মর্মেও নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে—যখন দেখা গেছে অনেক সাবেক যোদ্ধাই লোকসমাজে এসে 'রহস্যময়' রোগে মারা যাচ্ছে। ২০১৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত নর্দান প্রভিন্সে ওইরূপ ১০৫ জন সাবেক এলটিটিই যোদ্ধা পুনর্বাসিত অবস্থায় মারা গেছেন এবং স্থানীয় সমাজে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, ক্যাম্পে আটক অবস্থায় এদের শরীরে এমন কিছু প্রবেশ করানো হচ্ছে যা তাদের মৃত্যুর কারণ। একজন তামিল রাজনীতিবিদ সুরেশ প্রেমচন্দ্রন (Suresh Pramachandran) এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়ে জাতীয় বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছেন।[২৯] বলা বাহুল্য, এরূপ তথ্য প্রমাণবিহীন হলেও এসব বক্তব্য জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ একটি সমাজে সিংহলি প্রাধান্যপূর্ণ প্রশাসন এবং তামিল প্রাধান্যপূর্ণ এলাকার মধ্যে ব্যবধান ধরে রেখেছে এবং প্রকৃত পুনর্বাসনের নৈতিক শক্তিও দুর্বল করে রেখেছে। ভারতের, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর

প্রচারমাধ্যমগুলোতে শ্রীলঙ্কার এরূপ সংবাদ ব্যাপক কাভারেজ পাচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালের আগস্টে পুরো প্রদেশের সব জেলায় যুদ্ধ শেষে আটক অবস্থা থেকে পুনর্বাসিত এলটিটিই যোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নর্দান প্রভিন্সের সরকার একটি উদ্যোগ নিয়েছে।

বস্তুত যুদ্ধের পরপরই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এক বড় চ্যালেঞ্জ হলেও কেবল সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সরকার প্রথম এই সমস্যা মোকাবিলায় একটি নীতিমালা (National Policy on Durable Solutions for Conflict-affected Displacement) করতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় পুনর্বাসন বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় রয়েছে এবং দেশটির মানবাধিকার কমিশনেও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ে একটি বিশেষ ইউনিট বিদ্যমান। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত উদ্বাস্তু-সংকটের যে বহুমাত্রিকতা, তা প্রকৃতই অনেক বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সামর্থ্য দাবি করে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় পূর্ণ শ্রীলঙ্কায় তা আপাতত নেই।

এ ক্ষেত্রে প্রধান এক চ্যালেঞ্জ হলো ভূমি। কৃষিভিত্তিক সমাজে পুনর্বাসন উদ্যোগমাত্রই জমির প্রয়োজন। আবার চরমভাবে জাতিগত বিদ্বেষের উপস্থিতির কারণে জমি পাওয়ামাত্রই কাউকে পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক জাতিগত সমীকরণ এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে তাতে। ২৬ বছর স্থায়ী গৃহযুদ্ধের অন্যতম বিবাদিত বিষয়ও ছিল জমি। ফলে পুনর্বাসনকালেও জমির প্রশ্ন স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে আছে। যেসব উদ্বাস্তু নিরাপত্তাগত কারণে বা বেদখল হওয়ার কারণে তাদের বসতভিটায় ফিরতে পারছে না, তাদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এ ক্ষেত্রেও সমাধান সহজ নয়। কারণ, দেশটির আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারি কাজে অধিগ্রহণ করা হলেই কেবল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে। কিন্তু যুদ্ধকালে সৃষ্ট 'হাইসিকিউরিটি জোনে' জমি হারানো কীভাবে ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে, সেসবও এই অনুসন্ধানকালেও বিবাদিত বিষয় হয়ে আছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক চুক্তি ও চীনের সঙ্গে ভারসাম্যের চেষ্টা

সংবিধানের পাশাপাশি এ মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে আছে ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ঘিরে আবর্তিত বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে ভারতের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তথা চুক্তির বিষয়ে খুব আগ্রহী।

দেশের ব্যবসায়ী সমাজের একাংশ, রাজাপক্ষে ও জেভিপি চুক্তির বিরোধিতা করছে। জেভিপির অন্যতম মুখ্য নেতা অনুরা কুমার দেশনায়েকে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, এই চুক্তি শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাত্র।

তিনি এ বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের তাগিদ দেন।[৩০] কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে বলছেন, ২০১৭ সাল শেষ হওয়ার আগেই ভারতের সঙ্গে 'Economic and Technology Cooperation Agreement' (ECTA) চুক্তি করা হবে। তবে দেশটির বিভিন্ন খাতের পেশাজীবীরা, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা এই চুক্তির বিরোধী।

উল্লেখ্য, ২০০০ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মুক্তবাণিজ্য চুক্তি রয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে নতুন এই চুক্তির মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি চীনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ুক। ওবামার শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কাকে টিপিপি (Trans Pacific Partnership Agreement) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করারও চেষ্টা করেছিল বলে জানা যায়। বিক্রমাসিংহে, সিরিসেনা ও চন্দ্রিকার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত বোঝাপড়ারই ফসল ছিল ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজাপক্ষের অপসারণ এবং সিরিসেনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে জয়ী করে নিয়ে আসা। দেশটির রাজনীতিতে এটা ছিল নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ এক অধ্যায়। যুক্তরাষ্ট্র রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এই কারণে নয় যে তিনি তামিল সশস্ত্রতা নির্মূল করেছেন, বরং এই কারণে যে তিনি দেশটিকে চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত করেছিলেন। একই মনোভাব ভারতেরও।

বর্তমান সরকারের আমলে ভারত শ্রীলঙ্কাকে কাছে টানতে তামিলনাড়ু ও জাফনার মাঝে ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাবও দিয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে যা খুবই উচ্চাভিলাষী প্রস্তাব বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।[৩১] কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির বিস্তৃতির জন্য যা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় তামিল জাতীয়তাবাদ ও তামিলনাড়ুর প্রভাবও তাতে ব্যাপকতা পাবে। যদিও স্থানীয় জনগণের বিরোধিতার ভয়ে শ্রীলঙ্কার নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ে কিছু বলছেন না, কিন্তু ২০১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সড়কমন্ত্রী নীতিন গাটকর লোকসভায় জানিয়েছেন, তাঁর দেশ এডিবির কাছে ৫.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ চেয়েছে তামিলনাড়ু-জাফনা ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে বর্তমানে যে আট কোটি অধিবাসী রয়েছে তার অন্তত ২০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তামিলাড়ুর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ব্রিজধর্মী যোগাযোগ হলে উল্লিখিত ২০ শতাংশ দরিদ্রের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কায় আগমন সহজ করবে। আবার পাশাপাশি ECTA চুক্তি হলে তা অ-দরিদ্র, দক্ষ পেশাজীবীদের জন্যও শ্রীলঙ্কার দরজা খুলে দেবে। কারণ, যদিও এরূপ চুক্তিতে উভয় দেশের পেশাজীবীদের পরস্পরের দেশে অবাধে যাতায়তের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্যত ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় উচ্চমজুরির কারণে ভারতীয়

পেশাজীবীদেরই কলম্বোমুখী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ECTA মূলত দুই দেশে পেশাজীবীদের আগমন সহজতর করার লক্ষ্যে প্রণীত হচ্ছে এবং দুই দেশের আলোচনার টেবিলে তামিলদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের চেয়েও তা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। অন্যদিকে স্থল ব্রিজ বা সমুদ্রতলদেশ দিয়ে তৈরি টানেল শ্রীলঙ্কাকে ভৌগোলিকভাবেও উত্তর ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলবে। এরূপ সম্ভাবনার কারণে শ্রীলঙ্কার সিংহলি সমাজে উল্লিখিত প্রকল্প ও চুক্তিগুলো নিয়ে এ মুহূর্তে ব্যাপকভিত্তিক বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক এ কারণেও হচ্ছে যে ভারত যখন তামিলদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক চুক্তি ও তার স্থলভাগের সঙ্গে দ্বীপদেশটিকে যুক্ত করতে সচেষ্ট, তখন দুদেশের আন্তবাণিজ্য ব্যবধান ক্রমে বিপুলমাত্রায় বেড়েই চলেছে এবং উভয়ের সম্পর্কের অভিমুখ সেই ব্যবধান কমার কোনো ইঙ্গিত দেয় না।[৩২] আবার বর্তমান শাসকদের একাংশ এই বিতর্কে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে চীনকেও বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ভারতের মতোই সুযোগদানের কৌশল নিয়ে এগোতে ইচ্ছুক। যার অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা সরকার তার দেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত চীনের ১.৪ বিলিয়ন ডলারের 'কলম্বো পোর্ট সিটি প্রজেক্ট' থেকে সাময়িক স্থগিতাদেশ তুলে নেয়। কিন্তু দেশটির জাতীয় পরিসরের দুই প্রধান দলেই ভারতের মতোই চীনের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে মতদ্বৈধতা এবং উপদলীয় প্রতিযোগিতা থাকায় চীন-ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের ভারসাম্য মূলত নির্ভর করবে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোন উপদল কতটা শক্তিশালী ভূমিকায় থাকছে, তার ওপর। রাজাপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মধ্য দিয়ে আপাতত এই ভারসাম্য ভারতের পক্ষেই হেলে আছে এবং তামিল জাতীয়তাবাদীদের জন্য তা কিছুটা স্বস্তির কারণ।

তবে চীনও অতীতে ২০১০ থেকে ২০১৪ সময়ে কেবল রাজাপক্ষেকে সমর্থনদানকে ইতিমধ্যে 'এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখা'র মতো ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে দেশটির অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গেও 'সম্পর্ক' বিকশিত করে চলেছে, যা ভারতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।[৩৩] ইতিমধ্যে চীন শ্রীলঙ্কার সর্বদক্ষিণে নির্মিত গভীর সমুদ্রবন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছে, যা সংশ্লিষ্ট সাগরে তার ভূকৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করেছে।

এলটিটিইর পুনর্গঠিত হওয়ার শঙ্কা কিংবা সম্ভাবনা

এলটিটিই নেই প্রায় সাত বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় যে এলটিটিইর দীর্ঘ ছায়া বিদ্যমান, সেটা তামিল কিংবা সিংহলি কেউই অনানুষ্ঠানিক আলাপে অস্বীকার করেন না। যদিও প্রকাশ্যে তাঁরা ভিন্ন কথাই বলেন। এলটিটিইর

পুনর্জন্মের বিষয় নিয়ে শ্রীলঙ্কায় এবং বহির্বিশ্বে মাঝেমধ্যেই কিছু সংবাদ ও বিশ্লেষণ দেখা যায়। বর্তমান লেখক অন্যত্র[৩৪] দেখিয়েছেন যে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে এলটিটিইর প্রায় পুরো কাঠামো বিধ্বস্ত হলেও তার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক পুরোই অক্ষত রয়েছে। সব সূত্র দ্বারা এই তথ্যের নিশ্চয়তা মেলে।[৩৫] ইতিমধ্যে আমরা বলেছি যে শ্রীলঙ্কার তামিল জাতীয়তাবাদের উত্থানে প্রবাসী তামিলদের রয়েছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যা ইতিহাসে অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে প্রায় দেখা যায়নি বললেই চলে। যেহেতু রাজনীতিসচেতন অর্থের প্রবাহ এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে, তাই সেখানে অস্থিতিশীলতা ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

যদিও এ বিষয়ে রাজাপক্ষের মতো সিংহলি রাজনীতিবিদদের একাংশের অতিরিক্ত প্রচারণা রয়েছে এবং যদিও এলটিটিইর নেটওয়ার্ক বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু সব গ্রুপের কাছেই রয়েছে বিপুল অর্থসম্পদ এবং সব গ্রুপই দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের তামিল এলাকায় যোগাযোগ গড়ে তুলতে সক্রিয়। বিশেষ করে বিদেশে অবস্থানকারী তামিল টাইগাররা দেশে অবস্থানকারী সাবেক টাইগারদের মধ্যে যারা আর্থিক সংকটে রয়েছে, তাদের সহায়তার মাধ্যমে পুনরায় সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করছে। শ্রীলঙ্কার সেনা গোয়েন্দা সূত্রে এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে এলটিটিইর আন্তর্জাতিক কাঠামো বর্তমানে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করছে। এর একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন পি শিভপরান (P. Sivaparan) ওরফে নিদিয়াওয়ান এবং অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভিনয়াগম। প্রথমজন মূলত নরওয়েতে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং দ্বিতীয়জন অবস্থান করেন ফ্রান্সে। ভিনয়াগম এলটিটিইর গোয়েন্দা বিভাগের একজন সংগঠক ছিলেন। প্রভাকরণ মারা যাওয়ার পর এলটিটিইর আন্তর্জাতিক শাখা প্রথমে পাথমানাথন ওরফে 'কেপি'কে সংগঠনের নতুন নেতা নির্বাচন করেছিল। পাথমানাথন (Pathmanathan) নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু চার মাস পরই তিনি মালয়েশিয়ায় আটক হয়ে যান এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হন।[৩৬]

এই দুই ধারা ছাড়াও আরও কিছু সংগঠন আন্তর্জাতিক পরিসরে এখনো এলটিটিইর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বহন করতে তৎপর। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্ট অব তামিল ইলম (টিজিটিই) এবং ব্রিটেনভিত্তিক দ্য গ্লোবাল তামিল ফোরাম (জিটিএফ)। শেষোক্ত সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফাদার এমানুয়েল। আর প্রথমটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুদ্রাক্ষ কুমার। সব সংগঠনেরই মূল কর্মক্ষেত্র প্রধানত তামিলনাড়ু এবং দ্বিতীয়ত, শ্রীলঙ্কার নর্দান প্রভিন্স। এ ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে তামিল ইলম সাপোর্টার্স

ফোরাম (টিইএসও)। উপরিউক্ত সব উদ্যোগ থেকেই কাজ চলছে মুখ্যত ওই এলাকার এনজিও এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে।

এ কাজের প্রক্রিয়াতেই ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এলটিটিইর পুনরুত্থানের অন্তত তিনটি ছোট পরিসরের ঘটনা ঘটে এবং তিনটিই শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী বানচাল করে দেয়। প্রথমটি ঘটে ২০১২ সালের মার্চে, যখন ইস্টার্ন প্রভিন্সে সরকারপন্থী এক তামিল মিলিশিয়া সংগঠনে (EPDP) তামিলনাড়ু থেকে এলটিটিইর ১৫ সদস্যের একটি সেল গোপনে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ওই সেলের সদস্যরা ইপিডিপির এক কর্মীর খুনের ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা আবিষ্কৃত হয় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে কলম্বোতে। একজন অপুনর্বাসিত এলটিটিই ক্যাডার ও ছয় তামিল যুবককে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে তামিলনাড়ুতে নতুন করে তামিলদের রিক্রুটমেন্টের তথ্য জানা যায়। আর তৃতীয়টি ঘটে ২০১৪ সালের মার্চে কিলোনিচ্চিতে—সরাসরি গোলাগুলি আকারে। এ ঘটনায় ভাবুনিয়া জেলায় গবি, থাইভিগান ও আপ্পান নামে এলটিটিইর সাবেক তিন গেরিলা নিহত হন। উল্লেখ্য, গবিকে ধরার জন্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে ১০ লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনটি ঘটনায়ই স্থানীয় তামিলদের সঙ্গে এলটিটিইর প্রবাসী সংগঠকদের যোগাযোগের প্রমাণ মেলে।[৩৭] এ ছাড়া ২০১৭ সালেও নর্দান প্রভিন্সে এমনভাবে একজন পুলিশ নিহত হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় এটা জাতিগত সহিংসতার অংশ।

উল্লেখ্য, চূড়ান্ত যুদ্ধ শেষে যে প্রায় ১২ হাজার এলটিটিই যোদ্ধাকে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী আটক করেছিল ২০১৪ সালের মধ্যে, তার প্রায় পুরোটাই 'পুনর্বাসন'-এর মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয়। এলটিটিইর আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এখন এদের মাধ্যমে সংগঠনকে আবার দেশে পুনর্গঠিত করতে চাইছে এবং এ ক্ষেত্রে অন্যতম কাজ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে বিগত যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে লুকিয়ে ফেলা অস্ত্র খুঁজে বের করা।

তবে এলটিটিইর উত্থানের সব দায় অবশ্যই সংগঠনের বিদেশি সংগঠকদেরই নয়। বরং বলা যায়, স্বল্প মেয়াদে না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে শ্রীলঙ্কায় তামিল জাতীয়তাবাদের পুনঃসশস্ত্রতার ব্যাপক সম্ভাবনা এখনো বিদ্যমান—কারণ, তামিলদের প্রত্যাশিত দাবিদাওয়া এখনো পূরণ হয়নি। তবে পুনঃসশস্ত্রতার বাস্তব ঝুঁকি বিপুল। কারণ, দেশটির সেনাবাহিনীর আকার ইতিমধ্যে প্রায় দুই লাখ অতিক্রম করেছে[৩৮] এবং এর প্রায় ৩০ শতাংশই বর্তমানে তামিল-অধ্যুষিত নর্দান ও ইস্টার্ন প্রভিন্সেই থাকছে। এসব এলাকায় তাদের নজরদারি ব্যাপক এবং তীব্র নজরদারির পরও ২০১৬ সালেও প্রভাকরণের জন্মদিন (২৬ নভেম্বর) পালিত হয়েছে জাফনার বহু স্থানে।[৩৯]

তবে বাস্তবে প্রভাকরণের মতো আরেকজন নেতা খুঁজে পাওয়া এবং সন্ত্রাসবিরোধী চলতি বৈশ্বিক মনোভাবের মধ্যে আবারও সশস্ত্রতার পক্ষে সক্রিয় ভারতীয় সহায়তা পাওয়া এলটিটিইর জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা এ বিষয়ে একমত যে এলটিটিইর যেকোনো সশস্ত্র পুনরুত্থানের জন্য তামিলনাড়ুতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাওয়া জরুরি, যা এখন গোপনে বিদ্যমান হলেও প্রকাশ্যে পাওয়া সহজ নয়।[৪০] অন্তত দুটি কারণে এটা দুরূহ। প্রথমত, শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, তামিলনাড়ুতে গেরিলা উৎপাদনযন্ত্র সক্রিয় হলে তা ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে এবং তা থেকে যে চীন সুযোগ গ্রহণ করবে, সেটা ভারতের অজানা নয়।

এ ছাড়া ২০০৯ সালে শেষ হওয়া প্রায় ২৫ বছর স্থায়ী যুদ্ধের পর শ্রীলঙ্কার প্রভাবশালী নীতিনির্ধারকদের মধ্যে জাতিগত রেষারেষি থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে সিংহলি নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যেরূপ মনোভাব তামিল পরিসরে পুনরায় সশস্ত্রতার পাটাতন তৈরি করতে পারে এবং তামিল তরুণদের মধ্যে সশস্ত্রতার আবেদন তৈরি করতে পারে, আপাতত তা দুর্বল। তবে শ্রীলঙ্কার সরকারের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে এলটিটিইর সংগঠিত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্নরূপ আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয় এই কারণেও যে তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংগঠনটির নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ নবায়ন করানো সহজ হয়।

শেষ কথা

'নিরাপত্তা ধারণা'র পুনর্বিন্যাস ও আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ

শ্রীলঙ্কায় তামিল জাতীয়তাবাদের উত্থান ও নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরের সমকালীন পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান লেখায়। একই সঙ্গে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কার সংকট ও সেই সংকট উত্তরণের চেষ্টার পূর্বাপরও সংক্ষেপে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে এথনো পলিটিকস তথা জাতিগত টানাপোড়েনে 'ইতিহাস', মিথ ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাত কীভাবে বিবাদের জন্ম ও পুনর্জন্ম দিয়ে চলেছে—অন্তত এই দৃষ্টান্ত আমাদের তার রক্তাক্ত হদিস দিচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে সরে যাওয়ার সময় ব্রিটিশরা দেশটিকে বলত 'স্থিতিশীলতার মরূদ্যান'। স্থিতিশীলতার সেই মরূদ্যানে ঝড় তুলেছিল এলটিটিই। আর এলটিটিইকে নিষ্ক্রিয় করার মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কা তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে এক দফা রক্ষা করতে পারল। গৃহযুদ্ধ শেষে শ্রীলঙ্কার মূল অর্জন এটাই। শ্রীলঙ্কার এই অর্জন দক্ষিণ এশিয়াকেও আপাত এক 'স্থিতিশীলতা' দিয়েছে। তামিল 'ইলম' সফল হলে সেটা

স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে দেখা দিত কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, আরাকান, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বেলুচিস্তান ইত্যাদি স্থানে এবং বিশেষভাবে খোদ ভারতের তামিলনাড়ুতেও।

তবে এলটিটিইকে নিষ্ক্রিয় ও এর সামরিক উত্থানকে ধ্বংসের পরও শ্রীলঙ্কায় কেউই বিশ্বাস করে না, তামিল জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি, যেহেতু তামিল জাতীয়তাবাদ সামরিকভাবে দমিত হয়েছে মাত্র—সে কারণে এর পুনরায় উত্থানের সম্ভাবনা বেশ ভালোভাবেই জারি আছে। ফলে শ্রীলঙ্কার জন্য শ্রীলঙ্কাবাসীর মতোই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বেগও এখনো শেষ হয়নি। দেশটিতে তাই পূর্বতন 'নিরাপত্তা ধারণা'র সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে নতুন ধরনের নিরাপত্তা ধারণা (New Security Paradigm) নিয়ে কাজ করার বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। যে নিরাপত্তা ধারণার মূলে থাকবে 'জাতীয় সংহতি' গড়ে তোলা এবং নাগরিকদের মধ্যে জাতি ও ধর্মীয় পরিচয়-নির্বিশেষে বিশ্বাস ও আস্থার সেতু রচনা করা। তবে কাজটি সহজ নয়, অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয়—উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাতে। কারণ, জাতিগত 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর ঐতিহাসিক বয়ানগুলোকে অতিক্রম করে যেতে পারছে না বিবদমান কোনো সম্প্রদায়ই।

এলটিটিই বনাম সেনাবাহিনীর দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধের পরও দেশটিতে চেতনাগত পরিসরে আধিপত্যের চেতনা (Hegemonism), বিচ্ছিন্নতার চেতনা (Secessionism) এবং বহুত্ববাদের চেতনার (Pluralism) ত্রিমুখী এক যুদ্ধ প্রবলভাবে জারি আছে। শ্রীলঙ্কা 'রাষ্ট্র' গৃহযুদ্ধকালীন ২৬ বছর তার জন্য 'হুমকি' মনে করেছে অভ্যন্তরীণভাবে তামিলদের এবং বহির্দেশীয়ভাবে তামিলদের প্রতি প্রকাশ্য ও গোপন ভারতীয় সহায়তাকে। এই দুই হুমকি মোকাবিলা করে দেশের 'অখণ্ডতা' রক্ষাই ছিল তার পূর্বতন 'নিরাপত্তা ধারণা'র মূল কথা। বিশেষত ভারত কর্তৃক দলে দলে তামিল তরুণদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রীলঙ্কায় প্রেরণের মধ্য দিয়ে দেশটিতে চরম নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় এবং তার মোকাবিলায় সেখানে পাল্টা যে নিরাপত্তা ধারণা সৃষ্টি হয়, তারই চূড়ান্ত ফল ২০০৯ সালের চূড়ান্ত যুদ্ধ। ওই রূপ নিরাপত্তা ধারণার রেশ এখনো বহাল আছে। প্রধান দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো জাতীয়তাবাদী যুদ্ধরূপী মনোভঙ্গি প্রবল। যে মনোভঙ্গির প্রধান প্রকাশ হলো 'অপর'কে পূর্ণ পরাজিত ও অধস্তন না করে 'নিজ'-এর শান্তি আসতে পারে না। কিংবা 'অপর'-এর বিরুদ্ধে 'সামরিক বিজয়' ব্যতীত নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে না। এরূপ মনোভাবের ফলে দেশটি কার্যত একটি 'দুর্বল রাষ্ট্র' হিসেবেই থাকছে। তার মানবসম্পদ এমনভাবে বিভক্ত যে অন্তত একাংশ

'রাষ্ট্রীয় পরিচয়'কে ধারণ করতে অনিচ্ছুক, যা আবার এক দ্বিমুখী সংকট তৈরি করে। একদিকে দুর্বল রাষ্ট্র বলেই সে উপনিবেশ-উত্তর আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তুলতে বা পুনর্গঠন করতে পারছে না। আবার এগুলো গড়ে তুলতে অপারগতার কারণেই সে দুর্বল। এটাই আজকের শ্রীলঙ্কার সামনে প্রধান বিপদ এবং এরূপ 'বিপদ' থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর কোনো দেশই কমবেশি মুক্ত নয়।

শ্রীলঙ্কার জন্য অপর এক বিপদ হলো যুদ্ধে 'বিজয়'-এর মধ্য দিয়ে সমাজে-প্রশাসনে-রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর অবস্থান ও মতামতের যে গুরুত্ব বাড়ছে এবং একই সঙ্গে সিংহলি-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের যে স্ফুরণ ঘটেছে উভয়ই তা তামিলদের সঙ্গে কোনোরূপ আপস বা ছাড়ের বিরোধী। এ-ও জাতিগত 'পুনরেকত্রকরণ' ধারণার বিপরীতে বড় এক চ্যালেঞ্জ। এরূপ চ্যালেঞ্জ আমরা দেখব রোহিঙ্গাদের নিয়ে বার্মায়, জুম্মদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে, বালুচদের বিষয়ে পাকিস্তানে এবং বহু জাতিসত্তার মোকাবিলায় ভারতে।

তামিলদের যেসব ক্ষোভ এ মুহূর্তে খুবই তীব্র তার মধ্যে রয়েছে নর্দান ও ইস্টার্ন প্রভিন্সে অতীতে মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন। যার কোনো ন্যায়বিচার তারা পায়নি বলেই মনে করে। এরূপ বঞ্চনার বোধও তারা ভুলতে পারত যদি যুদ্ধ শেষে সিংহলি নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রত্যাশিত সংস্কার দ্রুত এগিয়ে নিতে সক্ষম হতো।

দেশটিতে মানবাধিকার সংকটের অন্যতম মূল কারণ হিসেবে এখনো রয়ে গেছে পারস্পরিক জাতিগত ঘৃণা। দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরও বিবদমান পক্ষগুলো মনে করে, পরস্পরকে ধারণ করার চেয়ে পরস্পরকে মোকাবিলা করাই তাদের নিরাপত্তার শর্ত। এই মনোভাবের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চেতনার জন্ম ও পুনর্জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে সেখানে হুমকি ও নাজুকতার আবহ থেকে নাগরিকদের মুক্তি ঘটেনি এখনো।

তামিল জাতীয়তাবাদ শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত যে সংকটকে উন্মোচিত করেছিল, তা এখনো বহাল আছে। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম, সিংহলিদের পাশাপাশি অন্যান্য জাতি এবং অঞ্চলগত প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়গুলো দেশটি এখনো মীমাংসা করতে পারেনি। ফলে দেশটির সম্প্রদায়গত ও অঞ্চলগত অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সবল নয়। দেশটির শাসকশ্রেণি জাতিগত পরিচয়-নির্বিশেষে নাগরিকদের ওপর এখনো কোনো হেজিমনি কায়েম করতে পারেনি কিংবা বলা যায় তার হেজিমনির চরিত্র এখনো জবরদস্তিমূলক। এটাই শ্রীলঙ্কা 'রাষ্ট্র'-এর ভাবাদর্শিক দুর্বলতার দিক। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রই এই রোগে ভুগছে।

তথ্যসূত্র :

১. Mohan K. Tikku, *Sri Lanka in Victory and War*, Oxford U. P., 2016, p.161.

২. *Politics of Ethnicity and Population Censuses in Sri Lanka*, Draft Paper, http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/SSDE/pdf/Silva.pdf (accessed on 20th Nov., 2016)

৩. দেশটির শুমারি তথ্যে ক্যাথলিক ও খ্রিষ্টানদের পৃথক ক্যাটাগরি আকারে দেখানো হলেও বর্তমান লেখায় তা একক 'খ্রিষ্টান' ক্যাটাগরিরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. 'তামিল' বলতে এখানে শ্রীলঙ্কার তামিলদের বোঝানো হচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় তিন ধরনের তামিল রয়েছে : ভারতীয় তামিল (যারা মূলত চা-শ্রমিক), মুসলমান তামিল ও শ্রীলঙ্কান তামিল।

৫. শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে ভারতের তামিলনাড়ুর প্রভাব নিয়ে বর্তমান লেখকের *শ্রী লঙ্কার তামিল ইলম : দক্ষিণ এশিয়ার জাতি-রাষ্ট্রের সংকট* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৬. J N Dixit, *Assignment Colombo*, Konaek Publishers, 1998, Delhi, p. xiii.

৭. যেমন ভারতে 'হিন্দুত্বভা' দর্শন 'ভারতভূমি' থেকে মুসলমানদের উৎখাতের মাধ্যমেই একে 'পরিশুদ্ধ' করার কথা বলে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের উদ্যোগটি ছিল ঐতিহাসিক সেই পরিশুদ্ধি ও পুনর্বিজয়ের একটি প্রদর্শনী। একই রূপ পরিস্থিতি আমরা দেখব শ্রীলঙ্কাতেও। সেখানে ২০০৯-এর যুদ্ধে বিজয়ের পর তামিলপ্রধান এলাকাগুলোতে সিংহলিরা যে একের পর এক গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে কিংবা তামিলরা যে উক্তরূপ মূর্তি অপসারণের দাবি তুলছে, তা-ও ঐতিহাসিক এইরূপ ভাবনারই ধারাবাহিকতা যে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড বিশেষ বিশেষ ধর্ম ও জাতির! ঐতিহাসিক নানান উপাখ্যানকে ব্যবহার করে সিংহলিদের কাছে তামিলরা যেমন 'আগ্রাসী ও দখলদার শক্তি' তেমনি দেশটির উত্তর ও পূর্বাংশের তামিলরা মনে করে 'এখানে সিংহলিরা হলো বহিরাগত।' যেমন ভারতেও মুসলমানরাও ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে 'বহিরাগত দখলদার' শক্তি। মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে পাঠ্যবই সংস্কার পর্যন্ত নানান রূপে এরূপ 'আগ্রাসী শক্তি'র বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ বিজয় অর্জন না করে দক্ষিণ এশিয়ার আধিপত্যশীল জাতিগুলোর 'হারানো গৌরব' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না!

৮. সমাজবিজ্ঞানী Beedict Anderson তাঁর গ্রন্থে এরূপ 'জাতি'সমূহকে বলেছেন Imagined Communities. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, 1983, London.

৯. কিছু চিতাবাঘ পাওয়া যায়—তবে এলটিটিইর পতাকায় চিতাবাঘ নয়—বাঘের ছবিই ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. যে সিংহলি রাজা (দুত্যুগামুনু, খ্রি.পূর্ব ১৬১-১৩৭) তামিল রাজা ইলারাকে হারিয়ে পুরো দেশকে সিংহলি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন বলে সিংহলি মিথে দাবি করা হয়। তাঁর প্রধান তিন সেনাপতির নামেও রয়েছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর তিনটি নেভাল বেস : কাঞ্চাদেওয়া, উইলুসুমানা ও গোতিমবারা।

১১. Beedict Anderson, *Ibid.*

১২. Sri Lanka: Proposed Counter Terrorism Act Worse Than The PTA, (18/10/2016),

http://srilankabrief.org/2016/10/sri-lanka-proposed-counter-terrorism-act-worse-than-the-pta/

১৩. http://www.nytimes.com/2015/09/28/opinion/sri-lankas-war-crimes-controversy.html (19 dec. 2015)

১৪. http://www.cpalanka.org/democracy-in-post-war-sri-lanka-dec2015/ (20th Dec. 2015)

১৫. NPC calls for investigation of death threats against Wigneswaran (8 Oct. 2016). http://www.tamilguardian.com/content/npc-calls-investigation-death-threats-against-wigneswaran

১৬. Sinhala and Tamil: Let's get together and reconcile, (31 May 2009), http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/681 (accessed 18 Nov. 2016)

১৭. যদিও সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী এই এমপিরা সংসদে 'বিরোধী দল' হতে পারেন না, কারণ তাঁরা মুখ্যত ফ্রিডম পার্টিরই সদস্য এখনো। কিন্তু তাঁরা সংসদে ও সংসদের বাইরে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতির বিরোধিতা করছেন।

১৮. বিশ্বে এরূপ বিষয়ে সাম্প্রতিক সব গণভোটে (ব্রিটেন, কলম্বিয়া, হাঙ্গেরি, থাইল্যান্ড) আপাত 'গণতান্ত্রিক' পথেই শান্তি ও জাতীয় মতৈক্যের প্রত্যাশার পরাজয় ঘটতে দেখা যাচ্ছে। যেমন ব্রিটেনে (জুন) ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা, না থাকা নিয়ে গণভোটে না থাকার পক্ষে রায় হয়েছে। কলম্বিয়ায় (অক্টোবর) গণভোটে বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার বিপক্ষে রায় হয়েছে। একই দিন অনুষ্ঠিত হাঙ্গেরিতে গণভোটে শরণার্থী ঠেকাতে সীমান্ত বন্ধের পক্ষে রায় দিয়েছে দেশবাসী। আর থাইল্যান্ডে (আগস্ট) গণভোটে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখলকারী সামরিক বাহিনী প্রণীত সংবিধান অনুমোদিত হয়।

১৯. CBK calls for a federal semi-secular constitution, 2016-09-15, http://www.dailymirror.lk/115874/CBK-calls-for-a-federal-semi-secular-constitution (accessed 22th Nov. 2016)

২০. Dr. Dayan Jayatilleka, Referendum on New Constitution Would be the 'Stalingrad Battle' of Sri Lanka, 17 August 2016, http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/47880 (accessed 10th Nov. 2016)

২১. 'India and Sri Lanka After the LTTE', *International Crisis Group,* Asia Report*,* No 206 (2011), *https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/206-india-and-sri-lanka-after-the-ltte.pdf* (accessed 10th Nov. 2016)

২২. সরকার ওয়েলফেয়ার সেন্টার বললেও এতে উদ্বাস্তুদের চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ থাকায় তামিলরা একে বলত concentration camps.

২৩. *Sri Lankan IDP camps*, https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankan_IDP_camps (accessed 15th Nov., 2016)

২৪. Fonseka Bhavani, Raheem Mirak, *Trincomalee High Security Zone and Special Economic Zone*, September 2009; *A brief profile of the Trincomalee High Security Zone and other land related issues in Trincomalee District*, The Centre for Policy Alternatives (CPA), Sri Lanka, May 2008.

২৫. দেশটির উদ্বাস্তু তামিল নাগরিকদের অনেকে রয়েছেন ভারতেও। যুদ্ধ সমাপ্তির প্রায় সাত বছর পরও এ লেখার সময় ভারতে প্রায় এক লাখ তামিল শরণার্থী ছিল। ভারতে অবস্থানকারী এই শরণার্থীদের মধ্যে একদল আছেন সেখানকার রাজ্য সরকার-নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পগুলোতে। এদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজারের মতো। এসব ক্যাম্পে শরণার্থীদের নির্দিষ্ট হারে ভাতা (পরিবারপ্রধানকে এক হাজার রুপি, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ৭৫০ রুপি এবং প্রত্যেক শিশুকে ৪০০ রুপি) ও চাল বা আটা দেওয়া হয়। এ ছাড়া সস্তায় জিনিসপত্র কেনার জন্য তাদের রয়েছে রেশন কার্ড। শরণার্থীদের সন্তানদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া ফ্রি। এই সুবিধা তারাই পায় যাদের শরণার্থী হিসেবে সনদ রয়েছে। তবে এর বাইরেও দেশটিতে অনেক তামিল রয়েছে। তাদের কেউ কেউ ভ্রমণ ভিসা নিয়ে এসে আর যাননি। আবার অনেক সাবেক তামিল সশস্ত্র ক্যাডারও পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়ে আছেন। সব ক্যাটাগরির শরণার্থীরা এখন আর দেশে ফিরতে ইচ্ছুক নন, বরং ভারতেই নাগরিকত্ব পেতে আগ্রহী তারা। তবে ভারত সরকার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দুদের সে দেশে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোষণা দিলেও তামিল এই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে ইচ্ছুক নয়। নির্বাচন এলে এদের প্রতি স্থানীয় প্রধান দলগুলোর সোচ্চার সহানুভূতি দেখা গেলেও নির্বাচনের পরে তারা সচরাচর সেই সব অঙ্গীকার ভুলে যান। সর্বশেষ নির্বাচনে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা তাঁর রাজ্যের তামিল শরণার্থীদের জন্য ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রস্তাব করেছিলেন।

২৬. অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের মতোই যুদ্ধবিধবাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কেও দেশটিতে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। দেশটির নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতে এই সংখ্যা ৮৯ হাজার। তার মধ্যে নর্দান প্রভিন্সে রয়েছে ৪০ হাজার এবং ইস্টার্ন প্রভিন্সে রয়েছে ৪৯ হাজার নারী। কেবল বাত্তিকালোয়া জেলাতেই ২০ হাজার যুদ্ধবিধবা রয়েছেন। উল্লেখ্য, দেশটির দক্ষিণেও বিপুল সিংহলি যুদ্ধবিধবা রয়েছেন, কারণ যুদ্ধে প্রচুর সিংহলি সৈনিকও মারা গেছে এবং অনেকে নিখোঁজও হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারি হিসেবে যুদ্ধবিধবাদের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। জাফনাভিত্তিক সেন্টার ফর উইমেন ডেভেলপমেন্ট দাবি করে থাকে, কেবল এই জেলাতেই ২৬ হাজার ৩৪০ জন বিধবা রয়েছেন, যাঁদের স্বামী যুদ্ধে মৃত বা নিখোঁজ। দেখুন : Subash Somachandran, *Sri Lanka: War widows left in poverty.* wsws.org, 27 Oct. 2010.

২৭. 'Orphaned children in North forgotten', *Daily Mirror*, Sri Lanka, 23 July 2010

২৮. Mohan K. Tikku, *Ibid,* P. 166.

২৯. P K Balachandran, Mysterious deaths of ex-LTTE cadres create unease in North Sri Lanka, Friday, September 09, 2016, *The Indian Express*, http://www.newindianexpress.com/world/Mysterious-deaths-of-ex-LTTE-cadres-create-unease-in-North-Sri-Lanka/2016/08/05/article3564839.ece (accessed 15th Nov., 2016)

৩০. *ETCA should not be alloud: JVP*, (21 Sep., 2016), http://www.hirunews.lk/143447/etca-should-be-allowed-jvp (retrive on 20th September 2016)

৩১. 'India to build sea bridge, tunnel to connect Sri Lanka,' *The Hindu* (December16,2015), http://www.thehindu.com/news/national/india-to-build-sea-bridge-tunnel-to-connect-sri-lanka/article7996560.ece

৩২. ২০১৫ সালের হিসাবে দেখা যায়, শ্রীলঙ্কায় ভারতের রপ্তানি ছিল ৪,২৬৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের। আর ভারতে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি ছিল মাত্র ৬৪৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের।

৩৩. ২০১৬ সালে এমনকি তামিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও কলম্বোয় চীনের রাষ্ট্রদূতকে বৈঠক করতে দেখা গেছে, যা স্থানীয় কূটনীতিকদের মধ্যে বিস্ময় জাগিয়েছে। দেখুন : China Adopts Balanced Policy in Sri Lanka by Cultivating Both the Maithri-Ranil Govt and Mahinda led Opposition (25 November 2016), *http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/49848* (retrive on 10th September 2016)

৩৪. আলতাফ পারভেজ, *শ্রী লঙ্কার তামিল ইলম: দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি-রাষ্ট্রের সংকট*, ঐতিহ্য, ২০১৭, ঢাকা।

৩৫. United States (US). 11 February 2016. Central Intelligence Agency (CIA). 'Sri Lanka.' *The World Factbook*; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html. [Accessed 22 Feb. 2016]

৩৬. ২০০৯-এর পর সরকারের হাতে আটক এলটিটিইর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন পাথমানাথন। কিন্তু তাঁর আটকের কিছুদিন পরই ২০১২-এর অক্টোবরে বিস্ময়করভাবে তিনি মুক্তিও পান এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরে NERDO নামে একটি এনজিও গড়ে তোলেন। এই এনজিও থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত তামিলদের পুনর্বাসনকাজ চালাতে শুরু করেন। ধারণা করা হয়, প্রবাসী তামিল সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্ররূপে সরকার পাথমানাথনের সঙ্গে রহস্যময় কিছু বোঝাপড়ায় এসেছে।

৩৭. এই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত জানতে দেখুন: R Hariharan, *Revival of Tamil Tigers in Sri Lanka*, http://www.claws.in/images/journals_doc/1435402295_RHariharan.pdf. [Accessed 2oth March. 2016]

Ges *Times of India*, 20th Dec. 2012 I *Daily Mirror*, 25th April 2014. ২০১৪-এর এক হিসাবে দেখা গেছে, (http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=srilanka) মূল যোদ্ধাসংখ্যা এখন তাদের প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার এবং রিজার্ভ সৈনিকসংখ্যা ৯৮ হাজার ২০০।

৩৮. 'SLA's 200,000 men could face any threat: Army chief', http://www.sundayobserver.lk/2010/07/25/sec04.asp [Accessed 10th March. 2016]

৩৯. http://indianexpress.com/article/world/world-news/ltte-leader-velupillai-prabhakaran-birthday-celebrated-in-jaffna-4397022/ (Accessed, November 26, 2016)

৪০. R Hariharan, *Revival of Tamil Tigers in Sri Lanka*, http://www.claws.in/images/journals_doc/1435402295_RHariharan.pdf. [Accessed 2oth March. 2016]

বই আলোচনা

ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণের ইতিবৃত্ত

আসজাদুল কিবরিয়া

দ্য এথনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন—ইলান পেপে
ওয়ানওয়ার্ল্ড পাবলিকেশনস, লন্ডন, ২০০৬; পৃষ্ঠা-২৫৬

এক

আজ থেকে শত বছর আগে মাত্র ৬৭ শব্দের একটি ছোট পত্র মধ্যপ্রাচ্য তথা গোটা বিশ্বের জন্য এক অশেষ বিপর্যয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড আর্থার বালফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ছোট পত্রটি লিখেছিলেন, যা কালক্রমে বালফোর ঘোষণাপত্র নামে পরিচিতি পায়। তাতে তিনি বলেন: 'মহামান্য (ব্রিটিশ) সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি গড়ে তোলার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন; আর এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বোত্তম প্রয়াস প্রয়োগ করা হবে এবং এটাও পরিষ্কার যে এমন কিছু করা হবে না, যা প্যালেস্টাইনে বিদ্যমান অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার কিংবা অন্য কোনো দেশে ইহুদিদের বিরাজমান অধিকার ও রাজনৈতিক অবস্থান ক্ষুণ্ন করতে পারে।' এই পত্র দেওয়া হয়েছিল জাইয়নবাদী নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে। এর ২০ বছর আগে ১৮৯৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্ব জাইয়নবাদী সংস্থা (ওয়ার্ল্ড জাইয়নিস্ট অর্গানাইজেশন)।

বালফোর ঘোষণার জের ধরে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা হয় জাইয়নবাদী বা উগ্র ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল। আর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালগ্নে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে তাদের পিতৃপুরুষের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়ন করা হয় হত্যা, হামলা, ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালিয়ে। লাখ লাখ ফিলিস্তিনি বা আরব হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী। অল্প কিছু যারা রয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে যারা ফিরে আসার সুযোগ পায়, তারা হয়ে পড়ে নিজ ভূমে পরবাসী ও অবরুদ্ধ। পুরো

প্রক্রিয়াটিকে ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ ইলান পেপে অভিহিত করেছেন, 'ফিলিস্তিনে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ' হিসেবে। এই শিরোনামে *(দ্য এথনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন)* তাঁর রচিত বইটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ইলান পেপেকে বলা হয় ইসরায়েলের নয়া ইতিহাসবিদ (নিও হিস্টোরিয়ান) বা সংশোধনবাদী (রিভিশনিস্ট) ধারার ইতিহাসবেত্তা। এই ধারার সূত্রপাত ঘটান মূলত ইসরায়েলের বেনগুরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেনি মরিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আভি শ্লিম। সেটা আশির দশকের একেবারে শেষভাগে। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন পরবর্তী সময়ে যোগ দেন। এই সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদেরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অভ্যুদয় বা ইসরায়েলের স্বাধীনতাকে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী। তাঁরা মনে করেন যে আরব তথা ফিলিস্তিনিরা হলো শিকার আর ইহুদি তথা ইসরায়েলিরা হলো আগ্রাসনকারী। আর তাই ইহুদিদের ওপর পরবর্তী সময়ে যে আঘাত-আক্রমণ নেমে এসেছে, তা মূলত ইহুদিদেরই আক্রমণ-হামলার প্রত্যুত্তর। মোটাদাগে তাঁরা (জাইয়নবাদী ও ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল পশ্চিমা বিশ্ব দ্বারা) 'ইসরায়েলের স্বাধীনতা নিয়ে প্রচলিত ও স্বীকৃত' মূল বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তথ্য-প্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন যে প্রকৃত সত্যগুলো ভিন্ন।

সংশোধনবাদী ইসরায়েলি ইতিহাসবিদেরা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলত পাঁচটি 'প্রচলিত ও স্বীকৃত' ভাষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠতায় যথেষ্ট ঘাটতি খুঁজে পেয়েছেন ও প্রকৃত সত্য চাপা দেওয়ার যাবতীয় প্রয়াসের প্রমাণ পেয়েছেন। প্রথমত, ব্রিটেন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে বলে বহুল প্রচলিত দাবির বিপরীতে তাঁরা বলছেন, ব্রিটেন বরং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিরা স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলা হলেও সংশোধনবাদীরা বলছেন, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা যেতে বাধ্য করা হয়েছে। তৃতীয়ত, ক্ষমতার ভারসাম্য আরবদের অনুকূলে থাকার দাবি ঠিক নয় উল্লেখ করে তাঁরা বলছেন, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রে ইহুদিরা অনেক এগিয়ে ছিল। চতুর্থত, ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য আরবদের সমন্বিত পরিকল্পনা ছিল—এই দাবি নাকচ করে সংশোধনবাদীরা বলছেন, আরবরা বরং বিভক্ত ছিল। পঞ্চমত, আরবদের অনমনীয়তা শান্তিপ্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত করার দাবির বিপরীতে সংশোধনবাদীরা বলছেন, শান্তিপ্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার জন্য মূলত ইসরায়েলই দায়ী।

তবে সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পাল্টা সত্যের কোনো কোনোটির কার্যকারণ নিয়ে মতভেদ আছে। ফিলিস্তিনি আরবরা যে

নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে বেনি মরিস দেখান যে এটা ছিল যুদ্ধের একটি অনিবার্য ফল। অন্যদিকে ইলান পেপে দেখাচ্ছেন, এটা ছিল জাইয়নবাদীদের একটি পরিকল্পিত কাজ। বলা যেতে পারে, এটাই পেপের বইটির সারভাষ্য। ১২টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইয়ে লেখক ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণ পরিকল্পনার ইতিহাস ও রূপরেখা তুলে ধরেছেন; জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ সংজ্ঞায়িত করে কেন তা ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রযোজ্য, সেটি ব্যাখ্যা করেছেন; জায়নবাদের উৎসমূলে আলোকপাত করেছেন; ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো তুলে ধরেছেন; এবং রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরুর পর থেকে ফিলিস্তিনিদের ওপর নিরন্তর নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন।

ইতিহাসবিদ ও গবেষক হিসেবে ইলান পেপের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, ফিলিস্তিনিরা যে জাইয়নবাদী ইসরায়েলের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ কর্মসূচির শিকার, তা প্রতিষ্ঠা করা। ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দলিলপত্র দিয়ে এবং আরবদের ভাষ্য ও তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে তিনি তাঁর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'হোলোকাস্টের পর মানবতার বিরুদ্ধে কোনো বড় অপরাধ লুকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের আধুনিক যোগাযোগচালিত বিশ্ব, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক সম্প্রসারণ আর কোনো মানবসৃষ্ট বিপর্যয় জনমানুষের চোখের আড়াল হতে বা অস্বীকার করতে সুযোগ দেয় না। তারপরও এ রকম একটি অপরাধ বিশ্বের জনমানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। সেটি হলো ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলিদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের অধিকারচ্যুত করা। ফিলিস্তিন ভূমির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুরু থেকে পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করা হয়ে আসছে, যা আজও ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর অপরাধ হিসেবে মেনে নেওয়া তো অনেক দূরে, যা কি না রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।' (পৃ-xiii)।

দুই

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আরবদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের বা নিধনের সত্যটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন এই 'জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ'[১] বলতে কী বোঝায়, তা সুস্পষ্ট করা। ইলান পেপে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংজ্ঞাকে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন, আন্তর্জাতিক আইনেই জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণকে বেশ ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে এবং এটাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হাচিনসন

এনসাইক্লোপিডিয়াসহ একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি বলছেন, কোনো ভূখণ্ডে একটি অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের জন্য সেখান থেকে অন্য কোনো নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে জোরপূর্বক বিতাড়ন করাই হলো জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করে বলছে, এর মূলে আছে কোনো একটি অঞ্চলের ইতিহাস মুছে ফেলার অপপ্রয়াস। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন বলেছে, কোনো একটি রাষ্ট্র বা সরকার যখন মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর আবাসভূমিতে একক জনগোষ্ঠীর শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিতাড়িত করে এবং এ জন্য বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ড চালায়, তখন তা রূপ নেয় জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণে। এসব সহিংস কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে নারী ও পুরুষদের আলাদা করে ফেলা, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যেন না পারে সে জন্য পুরুষদের হত্যা করা, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা এবং তাদের আবাসভূমিতে অন্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের বসত গড়ে তোলা।

পেপে জোর দিয়ে বলেছেন, ১৯৪৮ সালে জাইয়নবাদীরা তাদের 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' শুরু করে 'প্ল্যান দালেত' (সংক্ষেপে প্ল্যান ডি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যা আসলে ছিল ফিলিস্তিনে 'নিশ্চিহ্নকরণ'। এই নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে ঠান্ডা-মাথায় গণহত্যা, নির্বিচারে হত্যা, বেছে বেছে নিধন এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। এসবই ছিল যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যা কিনা ইসরায়েলের আনুষ্ঠানিক ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

ইলান পেপে এ-ও মনে করেন, রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের আবির্ভাবের পূর্বাপর সময় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে যে দুটি পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক ভাষ্য প্রচলিত আছে, সে দুটিতেই জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। ইসরায়েলি তথা জাইয়নবাদী ভাষ্য অনুসারে, স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল। আর ফিলিস্তিনিদের ভাষ্য হলো, তাদের ওপর বিপর্যয় বা 'নাকবা' নেমে এসেছিল, যদিও এটি নিজেই একটি ধোঁয়াশা অভিধা। কেননা, এটি বিপর্যয়ের ওপরই অধিকতর জোর দেয়, কেন বা কার দ্বারা সৃষ্ট, সে বিষয়ে নয়। বোঝাই যায় (আরবি) 'নাকবা' অভিধাটি গ্রহণ করা হয়েছিল ইহুদি নিধন বা হোলোকাস্টের (হিব্রুতে 'শোয়া') বিপরীতে, তবে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বাদ দিয়ে। ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালের জাতিগত নিধনের বিষয়টি বিশ্ববাসী যে ক্রমাগত অস্বীকার করে আসছে, তাতে এই অভিধাও এক অর্থে অবদান রেখেছে। (পৃ- xvii)। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মূলত হিটলারের জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর নেতৃত্বে যে ইহুদি নিধনযজ্ঞ চলে, সেটাই

হোলোকাস্ট হিসেবে কুখ্যাত। এই হোলোকাস্টে ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্বীকৃতি মিলেছে, যদিও প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আবার এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের সেমেটিয়-বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যা আরেক আলোচনার বিষয়।

ইলান পেপে জানতেন যে এ ধরনের একটি শিরোনাম দিয়ে বই প্রকাশ করা বা এ বিষয়ে কাজ করার ফলে তিনি ইসরায়েলি ও ইসরায়েল সমর্থক পশ্চিমা বিশ্বের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়বেন। একপর্যায়ে বইয়ের প্রকাশকও তাঁকে নামের বিষয়টা আবার ভেবে দেখতে বলেন।[২] তিনি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট ঘেঁটে সেখানে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের বিষয়ে কী বলা আছে, তা পর্যালোচনা করে আবারও নিশ্চিত হন যে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যা করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে, তা এই জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেখানকার বিবরণে শুধু বিতাড়নই নয়, বরং এর আইনগত দিকও তুলে ধরা হয়েছে, যা আসলে মানবতাবিরোধী অপরাধ। আর এই অপরাধের একমাত্র ক্ষতিপূরণ হলো, বিতাড়িত মানুষদের কাছে জানতে চাওয়া যে তারা তাদের আবাসভূমিতে ফিরে আসতে চায় কি না।

এই জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ বা নিধন চালানো এবং ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বরূপ বোঝার জন্য জাইয়নবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেওয়াটা জরুরি বলে মনে করেন ইলান পেপে। আর তাই তিনি এ সম্পর্কে প্রথম দিকেই আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জাইয়নবাদের শিকড় প্রোথিত ছিল সেই ১৮৮০-এর দশকে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে একটি জাতীয় পুনরুত্থান আন্দোলন হিসেবে, আর তা হয়েছিল ওই অঞ্চলের ইহুদিদের ওপর সৃষ্ট চাপের কারণে। চাপটা ছিল ক্রমাগতভাবে হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি। থিওডোর হারজেল নামের একজন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় ইহুদি রাজনীতিক ও সাংবাদিক এই আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত; যদিও তাঁর আগে থেকেই এই আন্দোলন দানা বাঁধে। জাইয়নবাদ আন্দোলন থেকে দাবি তোলা হয় যে ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হলো ইসরায়েলের ভূমি (ল্যান্ড অব ইসরায়েল বা এরতেজ ইসরায়েল), যদিও প্রথম দিকে আবাসভূমির স্থান সম্পর্কে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। ১৯০৪ সালে হারজেলের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং মূল লক্ষ্য হয় ফিলিস্তিনকে এই স্বতন্ত্র আবাসভূমিতে রূপান্তর করার। সে জন্য আবিষ্কার করা হয় এক নতুন তত্ত্ব : 'জনগণহীন একটি ভূমি, যা কিনা ভূমিহীন একটি জনগোষ্ঠীর জন্য।' শুরু হয় প্রচারণা : বাইবেলের সূত্রে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আসলে বহিরাগত ব্যক্তিদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, যা কিনা শুধু ইহুদিদের একক আবাসভূমি। কাজেই এই আবাসভূমি উদ্ধার করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সেখানে ইহুদি

ব্যতীত অন্য কারও কোনো অধিকার নেই ও থাকবে না। অথচ ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তখন বর্ধিষ্ণু ফিলিস্তিনি আরবদের বসবাস, যাদের সিংহভাগই মুসলমান। পাশাপাশি কিছু খ্রিষ্টান ও ইহুদির বসবাসও রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। ১৯২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশরাজ ম্যানডেটরি ফিলিস্তিনের শাসনভার গ্রহণ করে, যা চলে ১৯৪৮ সালের মে মাস পর্যন্ত। এটি ছিল জর্ডান নদীর পশ্চিম দিকের ভূখণ্ড, যেখানে আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্র ও তাদের দখলে থাকা পশ্চিম তীর ও গাজা অবস্থিত। ম্যানডেটরি ফিলিস্তিন কার্যত ইহুদিদের প্রতিশ্রুত আবাসভূমি গড়ে দেওয়ার পথ খুলে দেয়, যার বীজ রোপণ করা হয়েছিল কথিত বালফোর ঘোষণায়, যা এই নিবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে। জাইয়নবাদীরাও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে, যার একটি ছোট্ট প্রমাণ মেলে ১৯২৭ সালে প্রবর্তিত ধাতব মুদ্রায়। এই মুদ্রার গায়ে আরবি ও ইংরেজিতে ফিলিস্তিন নামটি খোদাই করার পাশাপাশি হিব্রুতেও তা খোদাই করা হয়। তবে হিব্রুতে ফিলিস্তিন নামের পাশাপাশি বন্ধনীতে সংক্ষেপে হিব্রু প্রথম হরফ 'অহ-লেফ'লেখা হয়, যার মানে হলো 'এরতেজ ইসরায়েল' বা ল্যান্ড অব ইসরায়েল। পেপে দেখাচ্ছেন যে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকেই সেখানকার ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি অধিবাসী আরবদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে, বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে আর জাইয়নবাদী তথা ইহুদি সেটেলারদের বিভিন্নভাবে অগ্রাধিকার সুবিধা দিতে থাকে। এর ফলে দলে দলে ইহুদিরা ইউরোপ ও অন্য আরব দেশ থেকে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমাতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিনিরা তা মেনে নিতে চায়নি বা মেনে নিতে পারেনি। তারাও ধীরে ধীরে শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে এভাবে ইহুদি অভিবাসীর ঢল নামলে নিজ দেশে তাদেরই সমস্যা হবে। অবশ্য ফিলিস্তিনি বা আরবরা যে এ জন্য খুব শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তার জোরালো প্রমাণ মেলে না। কিন্তু ব্রিটিশদের নানা ধরনের অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কারণে ১৯২৯-৩০ সালে আরবরা একবার ছোটখাটো একটা বিদ্রোহ করে। তবে ১৯৩৬-৩৯ সময়কালের দ্বিতীয় ও বড় ধরনের বিদ্রোহটি ব্রিটিশরাজকে শঙ্কিত করে। তাই তারা নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে আর অনেক ফিলিস্তিনি নেতাকে দেশছাড়া করে। আর এই গোলযোগের মধ্যেই পিল কমিশন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে একটি ছোট ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করে সেখানকার আরবদের পূর্বে ট্রান্স-জর্ডান ও পশ্চিমে মিসর-সংলগ্ন বৃহত্তর অংশে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়। পিল কমিশনের প্রস্তাবে জেরুজালেম ও বেথেলহামকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ছিটমহল হিসেবে রাখার কথাও বলা হয়। আরবরা এই প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করলেও জাইয়নবাদী নেতারা এতে সমর্থন দেয়। কেননা এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের একটি ভিত্তি রচিত হয়ে যায়।

এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, '(১৯৩৮ সালের) পরবর্তী বছরগুলোয় স্বদেশি আরবরা পশ্চিমের কাছে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের (আরবদের) নিজ ভূমি উৎসর্গ করতে হবে। তাদের কাছে সম্ভবত এটা বিস্ময়কর ছিল যে (জার্মানির) বাভারিয়ার অধিবাসীদের সরিয়ে সেখানে কেন একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করা হচ্ছে না। অথবা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার বাণী শুনতে হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বা নিউইয়র্কে কেন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।'[৩]

আবার ব্রিটিশরা অভিবাসী ইহুদিদের নিয়ে ১৯২১ সালেই গঠন করে হাগানা নামের আধা সামরিক বাহিনী। ১৯২১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যানডেটরি ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ বাহিনীর পাশাপাশি হাগানার সদস্যরাও আরবদের ওপর দমনপীড়ন চালায় এবং শেষ দিকে ব্রিটিশ বাহিনীকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। আরও দুটি জাইয়নবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ইরগুন ও লেহি (যা স্টার্ন গ্যাং নামে অধিক পরিচিত) ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাগানার সঙ্গে একীভূত হয়ে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

তিন.

ইলান পেপে ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের যজ্ঞ পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রধান খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়নকে। পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী বেন গুরিয়ন ১৯০৬ সালে অটোম্যান ফিলিস্তিনে অভিবাসী হয়ে আসেন। অসাধারণ বিচক্ষণতা, সাহস ও কূটকৌশলের অধিকারী গুরিয়ন বরাবরই কট্টর জাইয়নবাদী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অভ্যুদয় ঘোষণা করেন। তিনি ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত জাইয়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। ফিলিস্তিনিদের নিজ বাসভূমি থেকে জোরজবরদস্তি করে বিতাড়ন ছাড়া ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা হবে না, এটাই ছিল বেন গুরিয়নের মূলমন্ত্র। তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এই মূলমন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। তিনি যে ডায়েরি বা রোজনামচা

লিখতেন, তাতে প্রায় প্রতিটি পরিকল্পনা ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এটি একটি বড় ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের জন্য বেন গুরিয়ন ও তাঁর সহযোগী অন্য জাইয়নবাদী নেতাদের প্রয়োজন ছিল একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা, যেটি রূপ নেয় প্ল্যান দালেতে। ইলান পেপে বেশ বিস্তারিতভাবে 'প্ল্যান দালেত' বাস্তবায়নের বিভিন্ন ঘটনা গ্রন্থিত করেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ হয়েছে ইসরায়েলি দলিলপত্রের কারণে। এটা বেশ লক্ষণীয় যে জাইয়নবাদী নেতা ও তাঁদের সহযোগীরা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর প্রায় প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা এবং সেসব বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধই শুধু করেননি, দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এসব ঐতিহাসিক দলিলের স্থায়িত্ব বাড়িয়েছে, আবার সেগুলো ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সহায়তা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলিল অবমুক্ত করে থাকে, ইসরায়েলও তেমনিভাবে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক দলিলপত্র প্রকাশ করে। এই নীতিটি রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি স্বচ্ছতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পেপে আমাদের জানাচ্ছেন যে ফিলিস্তিনের প্রতিটি গ্রামের মানুষের সংখ্যা, গ্রামপ্রধান বা মুখতারের পরিচিতি, গ্রামে প্রবেশ-নির্গমনপথ ইত্যাদিসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল নিধন-বিতাড়নযজ্ঞ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পুরোদমে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। যে কটি গণহত্যা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে সবার আগে আসে দেইর ইয়াসিনের গণহত্যা। এ প্রসঙ্গে চমস্কি বলছেন, 'এপ্রিল মাসে ইরগুন-লেহি দেইর ইয়াসিনে যে গণহত্যা চালায়, তা আরবদের ব্যাপকভাবে পালাতে বাধ্য করে। ঘটনাটি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ইরগুন ও লেহির আনুষ্ঠানিক ভাষ্যে উঠে এসেছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসী অধিনায়ক মোশে দায়ানের জবানিতে, যিনি কিনা শতাধিক নারী-শিশুসহ ২৫০ জন অরক্ষিত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যার অভিযান পরিচালনার জন্য গর্বিত হয়েছিলেন।'[৪]

ফিলিস্তিনিদের স্বদেশ থেকে বিতাড়ন ও জোরপূর্বক ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে পশ্চিমা বিশ্ব, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আরব রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকার ওপর সংক্ষেপে কিন্তু তাৎপর্যবাহী আলোকপাত করেছেন পেপে। তিনি দেখিয়েছেন যে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ জাইয়নবাদী তথা ইহুদিদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করেছে, যা ইসরায়েলের শক্তিসামর্থ্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকেও ইহুদিরা অস্ত্র পেয়েছে অথচ এই দুটি দেশ আরব দেশগুলোয় অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তিনি

ব্রিটিশদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে ম্যানডেট শেষ হওয়া পর্যন্ত (১৪ মে, ১৯৪৮) ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত থাকলেও তারা তা পালন করেনি বা পালন করতে চায়নি। তিনি বলছেন, '১৯২৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ বলয়ের অধীনে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করত, উপনিবেশ হিসেবে নয়। ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে ইহুদিদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দুই-ই পূরণ হতে পারে। তাই তারা এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, যা সংসদে ও সরকারে দুই সম্প্রদায়েরই সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। বাস্তবে অবশ্য যা করা হলো, তা হলো জাইয়নবাদী উপনিবেশগুলোকে বাড়তি সুবিধা দান ও সংখ্যাগুরু ফিলিস্তিনিদের প্রতি বৈষম্য। প্রস্তাবিত নতুন আইনসভার ভারসাম্য ইহুদিদের অনুকূলে গেল। সেখানে ব্রিটিশ প্রশাসনের নিযুক্ত সদস্যরা ইহুদিদের মিত্র ছিল।' (পৃ-১৪)।

আরব বিশ্বের মধ্যে জর্ডানের বাদশা আবদুল্লাহ গোপনে বেন গুরিয়নের সঙ্গে সমঝোতা করে সে দেশের সেনাবাহিনীকে ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় নিয়োজিত করেননি। যেটুকু করেছিলেন, তা ছিল লোক দেখানো। ইলান পেপে লিখেছেন, 'যদিও জর্ডানের সেনাবাহিনী ছিল আরব বাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর তারা ইহুদি রাষ্ট্রটির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠেছিল, তবু ফিলিস্তিন যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল বাদশা আবদুল্লাহ যে জাইয়নবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কৌশলগত মৈত্রী গড়ে তোলেন তার মাধ্যমে।[৫] আর তাই আরব লিজিওয়েনর ইংরেজ কমান্ডার-ইন-চিফ গ্লাব পাশা ১৯৪৮ সালের যুদ্ধকে "নকল যুদ্ধ" বলে অভিহিত করেছিলেন।' (পৃ-১২৮)।

পেপে জানাচ্ছেন, মিসর একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার মাত্র দুদিন আগে ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় ১০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে, যার ৫০ শতাংশই ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য, যারা সদ্য জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের কোনো সামরিক প্রশিক্ষণই ছিল না, ছিল কেবল জঙ্গিপনা। সিরীয় বাহিনী তুলনামূলকভাবে প্রশিক্ষিত ছিল, তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিও জোরালো ছিল। কিন্তু ফরাসি ম্যান্ডেট থেকে সদ্যমুক্ত হওয়া দেশটির স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ফিলিস্তিনে এমন বাজেভাবে লড়েছিল যে ১৯৪৮ সালের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই ইহুদি রাষ্ট্রটি তার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয় গোলান উপত্যকা দখলের মাধ্যমে। অবশ্য ইসরায়েল গোলান উপত্যকা দখলে নেয় ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর। লেবাননের সেনাবাহিনী তো অনীহাভরে কোনোমতে

সীমান্তসংলগ্ন গ্রামগুলো রক্ষার চেষ্টা করেছিল। একমাত্র ইরাকি সেনাবাহিনী কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে ওয়াদি আরার ১৫টি গ্রাম রক্ষা পায়। সোজা কথায়, ইসরায়েলি শক্তিশালী বাহিনীর বিপরীতে আরব সেনাবাহিনীগুলো ছিল দুর্বল, সমন্বয়হীন ও দায়িত্বহীন। আরব সরকারগুলো দ্বিমুখী আচরণ করেছে। আরব লিগ জর্ডানের বাদশা আবদুল্লাহকে সব আরব বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নিয়োগ করে। অথচ তিনি পশ্চিম তীর জর্ডানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন, বেন গুরিয়নের এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্র আক্রমণে বিরত থাকেন। একজন ইরাকি জেনারেলকে করা হয়েছিল ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেননি। আর কথিত যুদ্ধ শুরুর অল্প পরেই আরব বাহিনীগুলোতে অস্ত্র সরবরাহে ঘাটতি দেখা যায়। পেপে বলছেন, 'জর্ডানীয়রা কখনোই ১৯৪৮ সালের মে, জুন ও জুলাই মাসের দিনগুলো ফিরে দেখেনি, যখন তারা সাধারণ আরব প্রচেষ্টাকে নিস্তেজ করার জন্য সবকিছুই করেছিল। অথচ ১৯৫৮ সালে বিপ্লবী শাসকেরা ইরাকে ক্ষমতায় আসার পর সে দেশের জেনারেলদের তাদের এই (১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিন) বিপর্যয়ে ভূমিকার জন্য বিচারের মুখোমুখি করেছিল।' (পৃ-১৩০)।

মোটকথা, আরব শাসকেরা শুরু থেকেই জাইয়নবাদীদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইসরায়েলের শক্তিমত্তা সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল না। একইভাবে নিজ বাহিনীগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কেও তারা ছিল অসচেতন। তাদের এই দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে বেন গুরিয়ন বেশ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি ও অন্য জাইয়নবাদী নেতারা ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন ও নিধনের যে ছক কষেছিলেন, তা অনেক সহজ হয়েছিল। সে কারণেই মিসরীয় যুদ্ধবিমান যখন কয়েক দফা তেল আবিবে বোমাবর্ষণ করে কিংবা সিরীয় বাহিনী যখন মিসরে ইহুদি বসতি দখল করে নেয়, তখন বেন গুরিয়ন তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা আক্রমণ বা প্রতিশোধের কোনো পদক্ষেপই নেননি। কেননা, তিনি জানতেন যে অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে। তার চেয়ে বরং ফিলিস্তিনিদের দেশছাড়া করার কাজটি জোরেশোরে চালিয়ে যাওয়াই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পেপে বলছেন, 'ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার অন্যতম মিথ যুদ্ধ (যা কিনা আরবদের আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল) শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিরা স্বেচ্ছায় পালাতে শুরু করার বিষয়টি যে হালে পানি পায় না, তা এতক্ষণে স্পষ্ট। আর এটা নিতান্তই অতিরঞ্জন যে ফিলিস্তিনিদের থেকে যেতে ইহুদিরা চেষ্টা চালিয়েছিল। অথচ এটাই ইসরায়েলি পাঠ্যবইয়ে এখনো তুলে ধরা হচ্ছে। আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই লাখ লাখ ফিলিস্তিনি বলপূর্বক বিতাড়িত হয়। আর যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে আরও কয়েক লাখ এই

বিতাড়নের শিকার হয়। আসলে বেশির ভাগ ফিলিস্তিনির জন্য ১৯৪৮ সালের ১৫ মে সেই সময় কোনো বিশেষ গুরুত্ব বয়ে আনেনি। বরং সেটি ছিল জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের ভয়াবহ দিনপঞ্জিতে আরেকটি বাড়তি দিন। আর এই নিশ্চিহ্নকরণ শুরু হয়েছিল পাঁচ মাসের বেশি সময় আগে।' (পৃ-১৩১)।

জাতিসংঘের ভূমিকারও সমালোচনা করেছেন পেপে। তাঁর মতে, জাতিসংঘ পুরো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে ও এখনো করে যাচ্ছে—সমস্যা সমাধানে একের পর এক বেঠিক ও বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব এনে। ১৯৪৭ সালে মাত্র দুই বছরের অনভিজ্ঞ জাতিসংঘ ফিলিস্তিনবিষয়ক বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ওই বছরের ২৯ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব দেয়, তাতে দেশটির জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত পরিচিতি ও প্রাধান্য পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়। পেপের মতে, 'যদি জাতিসংঘ ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আয়তন নির্ধারণ করত, তাহলে তা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের বেশি হতো না। কিন্তু জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের ওপর জাইয়নবাদী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী দাবি মেনে নেয় এবং আরেক ধাপ এগিয়ে ইউরোপে নাজি হোলোকাস্টের ক্ষতিপূরণ দিতে চায়।' (পৃ-৩১)।

জাইয়নবাদীরা ফিলিস্তিনিদের নিজ বাসভূম থেকে উৎখাতে জৈব-সন্ত্রাস বা জৈব-যুদ্ধভীতি[৬] তৈরির কাজও করেছিল, যদিও সেটা ছিল খুব সীমিত পর্যায়ে। পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলে জৈব অস্ত্র গবেষণা ও উদ্ভাবনের যে বিস্তার ঘটে, তার বীজ নিহিত ছিল এর মধ্যে। পেপে জানাচ্ছেন, উপকূলবর্তী আক্রে শহরটিতে বোমাবর্ষণ করেও তা দখলে নিতে বেগ পেতে হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে একপর্যায়ে হাগানা বাহিনী ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শহরের পানির মূল উৎস কাবরি ঝরনাধারায় টাইফয়েডের জীবাণু মিশিয়ে দেয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই আক্রেবাসী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিমুখী আক্রমণে দুর্বল ও ভীত হয়ে তারা ইহুদি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শহরটির পতনের পর ইহুদি বাহিনী অবাধে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পেপে আরও বলেন, '(একই বছর) ২৭ মে গাজায় পানির উৎসে বিষ মেশানোর এ রকম আরেকটি অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মিসরীয়রা ডেভিড হরিন ও ডেভিড মিজরাচি নামের দুই ইহুদিকে আটক করে। এরা গাজার কূপগুলোতে টাইফয়েড ও ডিসেন্ট্রির জীবাণু মেশানোর চেষ্টা করছিল। জেনারেল ইয়াদিন ঘটনাটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়নকে অবহিত করেন, যা তিনি তাঁর ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন কোনো বাড়তি মন্তব্য ছাড়াই। পরবর্তী সময়ে মিসরীয়রা ওই দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ইসরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিবাদ করেনি।' (পৃ-১০১)।

জাতিগত নিধনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনি নারীদের ধর্ষণ ও লাঞ্ছনার বিষয়টিতেও আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন পেপে। তবে তিনি বলছেন যে এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে কিছু তথ্য থাকলেও তা তারা সমন্বিতভাবে প্রকাশ করেনি। ইসরায়েলি আর্কাইভেও কিছু তথ্য মেলে ধর্ষকদের শাস্তি হওয়ার। বেন গুরিয়নের দিনলিপিতেও ইহুদি সেনাদের ধর্ষণকীর্তির উল্লেখ আছে। এগুলোর বাইরে ধর্ষক ও ধর্ষিতার বয়ান থেকে কতিপয় ধর্ষণের ঘটনা জানতে পাওয়া যায়, যদিও পেপের মতে, 'প্রথম ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া খুব কঠিন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তাদের কাহিনিগুলো ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সবচেয়ে মর্মভেদী ও অমানবিক কিছু অপরাধের ওপর আলোকপাতে সহায়তা করে।' (পৃ-২১০)।

তিনি আরও বলেছেন, প্রথাগত লজ্জা ও ক্ষত ফিলিস্তিনি নারীদের ধর্ষণবিষয়ক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। তবে তিনি আশাবাদী যে ১৯৪৮-৪৯ সময়কালে ইহুদি সেনারা হত্যা-লুণ্ঠনের পাশাপাশি যে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন করেছে, তা একদিন অবশ্যই কেউ না কেউ বিস্তারিত প্রকাশ করবে।

চার

'নাকবা অস্বীকার ও শান্তিপ্রক্রিয়া' শিরোনামে বইটির একাদশ অধ্যায়ে পেপে বলছেন যে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য দশকের পর দশক ধরে যে প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, তা আসলে একধরনের ধোঁকাবাজি এবং ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণ অব্যাহত রাখতে ইসরায়েলি কূটকৌশল। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর নিজেদের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতা প্রবলতর হয়ে ওঠায় জাইয়নবাদী রাষ্ট্রটি কথিত এই শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় তিনটি দিকনির্দেশনা বা স্বতঃসিদ্ধ নির্ধারণ করে। প্রথমত, 'ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের মূল রয়েছে ১৯৬৭ সালে, যা সমাধানে দরকার একটি চুক্তি, যা পশ্চিম তীর ও গাজার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। অন্য কথায়, যেহেতু এই এলাকাগুলো ফিলিস্তিনের মাত্র ২২ শতাংশ, সেহেতু ইসরায়েল এক ধাক্কায় শান্তিপ্রক্রিয়াকে মূল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ক্ষুদ্র একটি অংশে সীমিত করে ফেলে।...ইসরায়েলের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটি হলো, পশ্চিম তীর ও গাজায় দৃশ্যমান সবকিছুই ভাগ করা হবে। আর এই বিভক্তিকরণ শান্তির অন্যতম স্তম্ভ। ইসরায়েলের জন্য দৃশ্যমান সবকিছুর ভাগ শুধু ভূখণ্ড নয়, বরং মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহও এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইসরায়েলের তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ হলো, ১৯৬৭ সালের আগে নাকবা,

জাতিগত নিধনসহ যা কিছু ঘটেছে, সেগুলো কখনোই আলাপ-আলোচনায় আসবে না। এর তাৎপর্য খুব পরিষ্কার : এটা শান্তি আলোচনা থেকে শরণার্থীদের বিষয়টি পুরোপুরি সরিয়ে ফেলে ও ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার অধিকারকে নাকচ করে দেয়। ইসরায়েলি দখলদারির সমাপ্তিকে সংঘাতের সমাপ্তির সঙ্গে সমর্থক করে তোলা হয় এই স্বতঃসিদ্ধটির মাধ্যমে, যা কিনা আগের দুটি স্বতঃসিদ্ধ থেকে উৎসরিত। ফিলিস্তিনিদের জন্য অবশ্যই ১৯৪৮ সাল হলো সবকিছুর প্রাণ এবং কেবল অতীতের অন্যায়গুলোকে সংশোধন করা হলেই এই অঞ্চলে সংঘাতের অবসান হতে পারে।' (পৃ-২৩৯)।

ইসরায়েলের শিক্ষা ও জ্ঞানজগতের বেশির ভাগ মানুষ ফিলিস্তিনের জাতিগত নিধনকে বৈধতা দেয়, ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকে উপেক্ষা করে ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। বিষয়টি ইলান পেপেকে পীড়িত করেছে, যা বইয়ের সমাপনী (এপিলগ) অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'ইসরায়েলের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ও জ্ঞানায়তনিক (একাডেমিক) গবেষণার স্বাধীনতা সমুন্নত রাখায় নিবেদিত। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবকে বলা হয়, সবুজ বাড়ি (গ্রিনহাউস)। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল শায়েখ মুয়ান্নিস গ্রামের মুখতারের বাড়ি। কিন্তু আপনি যদি সেখানে নৈশভোজে কিংবা দেশের এমনকি তেল আবিব শহরের ইতিহাসবিষয়ক কোনো কর্মশালায় আমন্ত্রিত হন, তাহলে কখনোই এ কথাটি বলতে পারবেন না। ক্লাবের রেস্তোরাঁর মেন্যু কার্ডে জায়গার পরিচিতি হিসেবে বলা হয়েছে, এটি উনিশ শতকে গড়ে ওঠা, যা ছিল শায়েখ মুনিস নামের এক ধনাঢ্য লোকের। এই লোক আসলে কল্পিত, স্থানহীন অবস্থানে বাস্তবে অস্তিত্বহীন একটি বানোয়াট মানুষ, যেমনটা আরও অনেক অস্তিত্বহীন মানুষের কথা জানা যায়, যারা কিনা শায়েখ মুয়ান্নিস গ্রামে বসবাস করত আর যে জায়গাটিতে তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়েছে। অন্য কথায়, এই গ্রিনহাউস হলো ফিলিস্তিনের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের জায়নবাদী মহাপরিকল্পনা অস্বীকারের একটি প্রতীক। আর এই মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে অল্প দূরে সৈকতের নিকটবর্তী ইয়ারকান স্ট্রিটে অবস্থিত লাল বাড়ির (রেড হোম) তৃতীয় তলায়।' (পৃ-২৫৭)। উল্লেখ্য, তাঁর বইটির প্রারম্ভিকা অধ্যায় শুরু হয়েছে 'লাল বাড়ি'-এর উপাখ্যান দিয়ে। পেপে বলেছেন, ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ১১ জন জাইয়নবাদী নেতা ও তরুণ ইহুদি সেনা এই লাল বাড়িতে বসেই ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিল, যার সাংকেতিক নাম প্ল্যান দালেত।

ইলান পেপে দুঃখ করে বলেছেন, 'যদি তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ শিক্ষায়তনিক (একাডেমিক) গবেষণায় লিপ্ত থাকত, তাহলে উদাহরণ হিসেবে

আপনি ভাবতে পারতেন যে এর অর্থনীতিবিদেরা ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ ফিলিস্তিনি সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে,[৭] তার হিসাব নির্ধারণ করেছেন এবং একটি বিস্তারিত পরিসংখ্যাপত্র বা তালিকা তৈরি করেছেন, যা কিনা বিরোধ মিটমাট ও শান্তি স্থাপনের জন্য সমঝোতার কাজে সহায়ক হবে। ফিলিস্তিনিদের বেসরকারি মালিকানায় থাকা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, ওষুধের দোকান, হোটেল ও বাস কোম্পানি, তাঁদের পরিচালিত কফি হাউস, রেস্তোরাঁ, কারখানা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বে তাদের অবস্থান-জাইয়নবাদীরা ফিলিস্তিন দখল করার পর এ সবই তো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে অথবা "ইহুদি মালিকানায়" হস্তান্তর করা হয়েছে।...ক্যাম্পাসের দর্শনের অধ্যাপকেরা ইতিমধ্যে নাকবার সময় ইহুদি বাহিনীর গণহত্যার যে অপরাধ সাধন করেছিল, তার নৈতিক নিহিতার্থগুলো নিয়ে কাজ করতেন। ইসরায়েলি সেনা আর্কাইভ ও কথ্য ইতিহাস মিলিয়ে ফিলিস্তিনি উৎসগুলো ৩১টি নিশ্চিত গণহত্যার তালিকা করেছে, যা ১৯৪৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিরাত হাইফায় শুরু হয়ে ১৯৪৯ সালের ১৯ জানুয়ারি হেবরনের খিরবাত ইলিনে শেষ হয়েছে। এর বাইরে আরও অন্তত ছয়টি গণহত্যার ঘটনা রয়েছে। অথচ এখনো আমরা একটি সুবিন্যস্ত নাকবা স্মৃতি অভিলেখাগার পাইনি, যা কিনা গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের নামগুলো জানতে যে কাউকে সহায়তা করবে।...তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ইতিহাসবিদেরা আমাদের যুদ্ধ ও জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে পারতেন। কেননা, প্রয়োজনীয় সব সরকারি ও সামরিক দলিল ও অভিলেখাগারের সামগ্রী দেখায় তাঁদের অগ্রাধিকার রয়েছে। তবে, তাঁদের বেশির ভাগই আসলে সমজাতীয় আদর্শের মুখপাত্র হিসেবে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁদের যাবতীয় কাজে ১৯৪৮ সালের ঘটনাপ্রবাহকে "স্বাধীনতার যুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, এতে অংশগ্রহণকারী ইহুদি সেনা ও কর্মকর্তাদের গৌরবগাথা তুলে ধরা হয়েছে আর তাদের অপরাধকে লুকানো হয়েছে আর ভুক্তভোগীদের ওপর কলঙ্কলেপন করা হয়েছে।' (পৃ-২৫৭-২৫৮)।

পেপে বিশ্বাস করেন, ১৯৪৮ সালে তাদের সেনাবাহিনী যে হত্যা-লুণ্ঠন চালিয়েছে, সে বিষয়ে ইসরায়েলের সব ইহুদি অন্ধ নয়। বিতাড়িত, আহত, নির্যাতিত ও ধর্ষিতদের আহাজারির প্রতি তারা বধির নয়। বরং ফিলিস্তিনিদের নিধনযজ্ঞের বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি ইহুদি এখন ওয়াকিবহাল এবং তার চেয়েও বড় কথা, এই অপরাধের জন্য লজ্জিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। হতে পারে তাদের মোট সংখ্যা এখনো অনেক কম, তারপরও তারা আছে এবং বিশ্বাস করে যে শরণার্থী সমস্যাই চলমান সংঘাতের মূলে রয়েছে। এই

ইহুদিরাই ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে মিলে শান্তিতে বসবাস করতে আগ্রহী। পেপের ভাষায়, 'এদেরকেই পাওয়া যায় প্রায় পাঁচ লাখ "অভ্যন্তরীণ" ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রামগুলোয় যৌথ তীর্থযাত্রায় এরাই যোগদান করে, প্রতিবছর (হিব্রু দিনপঞ্জি অনুসারে) ইসরায়েলের আনুষ্ঠানিক "স্বাধীনতা দিবসে"-এর পাশাপাশি নাকবা স্মরণ অনুষ্ঠানে এরা উপস্থিত থাকে।' বস্তুত ইলান পেপে যাদের কথা বলছেন, এ রকম অনেক শান্তিবাদী ইসরায়েলিকে আমরা কয়েক দশক ধরে সক্রিয় দেখতে পাই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের অপরাধ-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে। আর তা করতে গিয়ে তাঁরাও স্বজাতির ও স্বদেশের মানুষের কাছে নানাভাবে অপদস্থ হয়েছেন।

পাঁচ

ইলান পেপের তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী বইটি সংক্ষেপে দেখলে যে মূল বিষয়গুলো পাওয়া যায়, তা এ রকম: (১) জাইয়নবাদীরা বাইবেলের মিথের ওপর ইহুদিদের জন্য প্রতিশ্রুত ও স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তৈরি করেছে; (২) এই প্রতিশ্রুত ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি একটি কল্পিত ধারণা, যা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্ধসত্য, মিথ্যা ও কল্পনানির্ভর নিরন্তর প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে ও এখনো হচ্ছে; (৩) এই আবাসভূমি বা ইসরায়েলের ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য বলপূর্বক অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনি আরবদের তাদের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে; (৪) এই উচ্ছেদপ্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগতভাবে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া; (৫) ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণের কাজটিকে জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে; (৬) অস্বীকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণের কর্মকাণ্ড মুছে ফেলার নিরন্তর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; (৭) ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণ আজও অব্যাহত আছে। বইটিতে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দিন-তারিখ ধরে বিভিন্ন হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে এই অবস্থা থেকে আদৌ কোনো উত্তরণ হবে কি? পেপে এর কোনো ইতিবাচক জবাব দিতে পারেননি এ জন্য যে তিনি জাইয়নবাদের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝেছেন। তিনি মনে করেন, 'না ফিলিস্তিনি, না ইহুদি, কেউই একে অন্যের থেকে বা নিজেরা নিজেদের থেকে রক্ষা পাবে, যদি ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের নীতিকে যে আদর্শবাদ ধাবিত করছে, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা না হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের সমস্যা এর ইহুদিত্ব নয়। ইহুদিবাদের নানা রূপ আছে,

যার অনেকগুলোই শান্তি ও সহাবস্থানের নিখাদ ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সমস্যা হলো এর জাতিগত জাইয়নবাদী চরিত্র। ইহুদিবাদ যতখানি বহুত্ববাদী (প্লুরালিজম) অবস্থানের সুযোগ দেয়, জাইয়নবাদ তা দেয় না, ফিলিস্তিনিদের জন্য তো নয়ই। তারা কখনোই এই জাইয়নবাদী রাষ্ট্রের অংশ হতে পারবে না, এখানে স্থান পাবে না। ফলে তাদের লড়াই চলবে আর এটা আশা করা যায় যে তা শান্তিপূর্ণ ও সফল হবে। যদি তা না হয়, তাহলে তা হবে বেপরোয়া ও প্রতিশোধপরায়ণ, অন্তহীন বালুরাশি টেনে একটি ঘূর্ণিবায়ুর মতো, যা শুধু আরব ও মুসলিম বিশ্বেই নয়; বরং ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও উন্মত্ততার মতো ছড়িয়ে পড়বে। আর এই দুই শক্তিই তো যে ঝড় ধেয়ে আসছে আমাদের ধ্বংস করার জন্য, সেই ঝড়কে উসকে দিয়েছে। ২০০৬ সালের গ্রীষ্মে গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের আক্রমণ এটাই ইঙ্গিত করে, এই ঝড় ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো সংগঠন, যারা ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের একতরফা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারকে সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন তুলে ইসরায়েলি সামরিক পরাক্রমের শিকার হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত (বই ছাপাখানায় যাওয়ার প্রাক্কালে) টিকে রয়েছে। কিন্তু এর শেষ অনেক দেরি। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের আঞ্চলিক দুই পৃষ্ঠপোষক, সিরিয়া ও ইরান, ভবিষ্যতে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে, যা আরও বড় ধরনের সংঘাত ও রক্তপাতের ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা আগে কখনো এতটা প্রবল ছিল না।' (পৃ-২৬১)।

তথ্যসূত্র

১. Ethnic Cleansing-এর বাংলা হিসেবে এখানে 'জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ' ও 'জাতিগত নিধন' শব্দযুগল ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি বোঝাতে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাই আগে আরেক আলোচনায় ব্যবহৃত 'নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান' এখানে পরিহার করা হয়েছে।

২. Media, ISM (২০১০)

৩. p-92, Chomsky, Noam (২০০৪)

৪. p-95, Chomsky, Noam (২০০৪)

৫. ম্যানডেট শেষ হওয়ার অল্প কদিন আগে গোল্ডা মেয়ার (ইসরায়েলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বের তৃতীয়) ছদ্মবেশে জর্ডানে গিয়ে বাদশার সঙ্গে দেখা করেন। যদিও আবদুল্লাহ তখন আরববিশ্বের অন্যদের চাপে আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন। তাতে অবশ্য পরিস্থিতি তেমন পাল্টায়নি।

৬. Biological warfare

৭. ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়ে আঙ্কটাডের হালনাগাদ প্রতিবেদনের কিছু তথ্য পরিশিষ্টে তুলে ধরা হয়েছে। (http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1317)

তথ্যপঞ্জি ও টীকা

১. Media, ISM. (2016). 'Interview with Ilan Pappé:.' *International Solidarity Movement*. N.p., 09 July 2013. Web. 23 Nov. 2016. <https://palsolidarity.org/2013/07/interview-with-ilan-pappe-the-zionist-goal-from-the-very-beginning-was-to-have-as-much-as-palestine-as-possible-with-as-few-palestinians-in-it-as-possible/>.

২. Lendman, Stephen. (2016) 'The Ethnic Cleansing of Palestine by Ilan Pappe.' *Global Research*, 7 Feb. 2007. Web. 30 Oct. 2016. <http://www.globalresearch.ca/the-ethnic-cleansing-of-palestine-by-ilan-pappe/4715>.

৩. Chomsky, Noam (2005) *Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians*. New Delhi, 2005.

পরিশিষ্ট-১

ইসরায়েলি দখলদারত্বে থাকা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের (পশ্চিম তীর ও গাজা) অর্থনীতি নিয়ে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (আঙ্কটাড) এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইসরায়েলি দখলদারত্ব বজায় না থাকলে ফিলিস্তিনের অর্থনীতি অন্তত দ্বিগুণ হতো, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমত। একাধিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে আঙ্কটাড বলছে, ফিলিস্তিনিদের জমিজমা, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত, মানুষ ও পণ্যের চলাচল সীমিত এবং সম্পত্তি ও উৎপাদনশীলতা ধ্বংস করে দেওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ বাজার বিভক্ত করে দেওয়া, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ও ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের দখলদারত্ব ফিলিস্তিনি জনগণকে মানবাধিকার ও উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, ফিলিস্তিনের অর্থনীতিকে ফাঁপা করে দিচ্ছে। আঙ্কটাডের হিসাব বলছে, ১৯৭৫ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ৪০ বছরে ফিলিস্তিনের জিডিপিতে বাণিজ্যযোগ্য কৃষি ও শিল্পপণ্যের হিস্যা অর্ধেকে নেমেছে—৩৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ১৮ শতাংশে। আর কর্মসংস্থানে এর অবদান ৪৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ২৩ শতাংশে।

ইসরায়েলি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগ মোট যে পরিমাণ আমদানি পণ্য শুল্কায়ন ও ছাড় করে, তার মাত্র ৬ শতাংশ ফিলিস্তিনের আমদানি। অথচ এই আমদানির বিপরীতে চড়া হারে মাশুল আদায় করে ইসরায়েল, যা দিয়ে জাইয়নবাদী রাষ্ট্রটির শুল্ক বিভাগের বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নির্বাহ করা হয়। আঙ্কটাড বলছে, যদি ফিলিস্তিনের আমদানির আনুপাতিক হারে মাশুল আদায় করা হতো, তাহলে ফিলিস্তিন জাতীয় কর্তৃপক্ষ বছরে অন্তত পাঁচ কোটি ডলার বাড়তি ব্যয় থেকে রেহাই পেত আর তাদের রাজস্ব ঘাটতি কমত অন্তত সাড়ে ৩ শতাংশ।

ইসরায়েলি দখলদারত্বে থাকা পশ্চিম তীরের ৬০ শতাংশ ও আবাদযোগ্য ৬৬ শতাংশ ভূমিতে (যা এলাকা-সি হিসেবে পরিচিত) ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে ২০১৫ সালে ফিলিস্তিনি জিডিপির (৪৪০ কোটি ডলার) অন্তত ৩৫ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। গাজায় উৎপাদকেরা চাষযোগ্য অর্ধেক জমিতে ও ৮৫ শতাংশ মৎস্য সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তিনটি ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে যে ক্ষতি হয়েছে, তা গাজার জিডিপির কমপক্ষে তিনগুণ।

ফিলিস্তিনিদের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস জলপাই। ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৮ লাখ জলপাইগাছসহ ২৫ লাখের বেশি ফলদ গাছ বিনষ্ট করা হয়েছে। শুধু ২০১৫ সালেই কেটে ফেলা ও উৎপাটন করা হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ ফলদ গাছ। ফিলিস্তিনিদের পানির উৎস পুরোপুরি ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণে। তারা নিজেরা কুয়া খনন করতে পারে না। ইসরায়েলি কোম্পানির কাছ থেকে চাহিদার অন্তত ৫০ শতাংশ পানি চড়া দামে কিনতে হয়। ইসরায়েল ফিলিস্তিনের অন্তত ৮২ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানি অসলো চুক্তিতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি মাত্রায় টেনে নিচ্ছে শক্তিশালী মোটর ব্যবহার করে।

আঙ্কটাড প্রতিবেদন দেখায়, দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বেকারত্ব ২৫ শতাংশ আর সেখানকার ৬৬ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। গাজার চিত্র অবশ্য আরও করুণ, যেখানে বেকারত্ব ৩৮ শতাংশ আর ৭৩ শতাংশ অধিবাসীর মানবিক সাহায্য প্রয়োজন। তথ্যসূত্র: http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1317

লেখক পরিচিতি

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিংকন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া* (রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮); *ইসলাম অ্যান্ড আইডেন্টিটি পলিটিকস অ্যামাং ব্রিটিশ বাংলাদেশিজ: আ লিপ অব ফেইথ* (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩), *হাউ ডিড উই অ্যারাইভ হিয়ার* (প্রথমা, ২০১৫); *বাংলাদেশ: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইনডিপেনডেন্স* (আই বি টরিস, ২০১৬)।

শাহাদুজ্জামান

শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়। গল্প ও উপন্যাস তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলেও গবেষণা, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং প্রবন্ধ সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে তাঁর। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে। পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

হান্নাহ বিচ

পেশায় সাংবাদিক। কাজ করেন *টাইম* ম্যাগাজিনে। কাজের ক্ষেত্র এশিয়া। মাঝে মাঝে *টাইম* ম্যাগাজিনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আগস্ট ২০১৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংককে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সংকটে তিনি সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ে প্রতিবেদন করেছেন। কলবি কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে পড়াশোনা শেষ করেন। সাংবাদিকতায় বেশ কিছু স্বনামধন্য পুরস্কারও রয়েছে হান্নাহ বিচের।

আলতাফ পারভেজ

লেখক, গবেষক, সাংবাদিক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষ করে সাংবাদিকতার পাশাপাশি গবেষণামূলক কাজ করেছেন মূলত পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ও দলিত বিষয়ে। সাংবাদিকতায় তিনি আশির দশকে আনসার বিদ্রোহ ও কারা বিদ্রোহের ওপর অনুসন্ধানী কাজে 'কাউন্টার রিপোর্টিং' ধারণার প্রবর্তন করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *শ্রীলঙ্কার তামিল জাতীয়তাবাদ: দক্ষিণ এশিয়ার জাতিরাষ্ট্রের সংকট*।

আসজাদুল কিবরিয়া

লেখক ও সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি বেশি করেন। ইতিহাসে আগ্রহী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *অর্থনীতির অনর্থ* (জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪); *ট্রানজিটের টানাপোড়েন* (জাগৃতি, ২০১২)। *ভাষা আন্দোলনের গল্প* (প্রজাপতি, ১৯৯৪) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১

SARA
Sonio Villa
RAJUK APPROVED
Flat For Sale
Luxury, comfortable & affordable lifestyle
FLAT SIZE
TYPE A : 900 sft
TYPE B : 1200 sft
TYPE C : 980 sft
TYPE D : 1020 sft
TYPE E : 980 sft
TYPE F : 1020 sft
HOT LINE
019 63 90 80 90
019 63 90 80 91
019 63 90 80 92
SARA
Properties Ltd.